

দুর্গা।

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ
প্রণীত।

মূল্য ৺০ আনা।

প্রকাশক—

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়

২০১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কান্তিক প্রেস

২০, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত।

নিবেদন।

মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত শ্রীশ্রী৺ চণ্ডীর আখ্যান শ্রদ্ধাবান হিন্দুর পরম প্রিয় সামগ্রী। যাহাতে হিন্দু বালকবালিকার জ্ঞাতব্য হয়, এইজন্য "ভারতীয় বিদুষী" প্রণেতা মদীয় স্নেহ ভাজন শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় সরল বাংলায় ইহার একটী সংস্করণ প্রকাশিত করিতে আমাকে অনুরোধ করেন। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া ইহার কাঠিন্য উপলব্ধি করিয়াছি। সমস্ত দেবীমাহাত্ম্যের আভাস দিতে ত পারিই নাই, যেটুকু লইয়াছি, তাহাও আশানুরূপ সরল হইয়াছে মনে করি না। সভয়ে জগদম্বিকার নাম স্মরণ করিয়া ইহা পাঠক পাঠিকার করে অর্পণ করিলাম।

পরিশেষে বক্তব্য এই পুস্তিকা প্রণয়নে আমি মদীয় শ্রদ্ধেয় সুহৃৎ শ্রীঅবিনাশচন্দ্র

মুখোপাধ্যায় সঙ্কলিত "দেবী-মাহাত্ম্যের" সাহায্য লইয়াছি। তাঁহার কৃত বাংলা অনুবাদ এমন সুন্দরও সরল হইয়াছে যে, স্থানে স্থানে তাহা গ্রহণের লোভ আমি সংবরণ করিতে পারি নাই।

সাতক্ষীরা ভবন
কাশীপুর
১৫ আশ্বিন,
১৩১৬ সাল। } শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ শর্ম্মণঃ।

উৎসর্গ।

আমার পরলোকগতা ৺মাতৃদেবীর উদ্দেশে এই মাতৃ-মাহাত্ম্য অর্পণ করিলাম।

দুর্গা

(১)

আমি তোমাদের কাছে শ্রী দুর্গাদেবীর কথা বলি। এই কথা মার্কণ্ডেয় নামে এক ঋষি বলিয়া গিয়াছেন। ঋষিগণ ঘর সংসার ছাড়িয়া বনে বাস করিতেন, বাকল পরিতেন, ফল মূল খাইয়া প্রাণধারণ করিতেন। আর দিবারাত্রি ভগবানের আরাধনা করিতেন। ধনে মানে তাঁহাদের লোভ ছিল না। ভাল খাইব, ভাল পরিব, অট্টালিকায় বাস করিব এ প্রবৃত্তিও তাঁহাদের ছিল না। গাছের ফলে আর নদীর জলে কোন রকমে তাঁদের ক্ষুধা-তৃষ্ণার নিবারণ হইলেই তাঁহারা যথেষ্ট বোধ করিতেন। দিবারাত্রি ভগবানের চিন্তা করাই তাঁহাদের কাজ ছিল। তাঁহাদের গর্ব্ব

অহঙ্কার দ্বেষ ঈর্ষা একেবারেই ছিল না। ক্রোধ যে কাকে বলে, তাহা তাঁহারা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহারা সর্ব্বদাই শান্ত ভাবে শাস্ত্র চর্চ্চা করিতেন ও সত্য কহিতেন। যেখানে তাঁহারা বাস করিতেন, তাহাকে লোকে সচরাচর ঋষির আশ্রম বলিত।

সেই সকল আশ্রমে বাঘ, হরিণ, গরু, সিংহ, বিড়াল, ইন্দুর, সমস্ত জন্তু এক সঙ্গে বাস করিত। এক জন্তু অন্য জন্তুকে হিংসা করিত না। পাপ কিম্বা মিথ্যা সেই আশ্রমগুলির ধার দিয়াও যাইতে পারিত না।

এ হেন সকল গুণের, সকল পুণ্যের আধার ঋষি এই কথা বলিয়া গিয়াছেন। বলিয়াছেন কেন? জীবের মঙ্গলের জন্য। কেননা এ জগতে তাঁহাদের পাইবার কিছু ছিল না। পূর্ব্বেই ত বলিয়াছি, তাঁহারা ধন মান যশ কিছুই চাহিতেন না। তবে একটী জিনিষ তাঁহারা সর্ব্বদা চাহিতেন। সে জিনিষটী

আমাদের কল্যাণ। আমাদের কল্যাণের জন্যই তাঁহারা ঘর সংসার ছাড়িয়া ছিলেন, আমাদের কল্যাণের জন্যই তাঁহারা ঘর সংসারের সুখকে বিসর্জ্জন দিয়া বনবাসী হইয়াছিলেন, কেবল আমাদের কল্যাণের জন্যই তাঁহারা ভগবানের নিত্য পূজা করিতেন।

কথাটা শুনিয়া তোমাদের কেমন একটা বিস্ময় বোধ হইতেছে, না? তা যদি হয়, তাহা হইলে এখন আর উপায় নাই। তোমরা বুঝিতে চেষ্টা করিলে অনেকেই বুঝিতে পারিবে। বড় হইলে ঘর সংসার করিলে কাহারও বুঝিতে বাকী থাকিবে না।

তবে এটা তোমরা সকলেই শুনিয়া রাখ, সত্যই যাঁহাদের জীবনের ব্রত, সেই পুণ্যময় ঋষিদের বাক্য মিথ্যা নয়। শ্রীদুর্গার গল্প শুনিতে একটু বিচিত্র বোধ হইলেও জানিও তাহা মিথ্যা নয়। তাঁহার কথা ভক্তি সহকারে শুন, তোমাদের মঙ্গল হইবে।

দুর্গা

প্রতি বৎসর শরৎকালে আমাদের ঘরে মা দুর্গার আবাহন হয়। তোমরা হয়ত বলিবে, "এ কেমন কথা! সকল ঘরে ত মা আসেন না! এখন কয়জনই বা মায়ের পূজা করে?" তোমরা হয়ত বলিবে—"আমরা ঠাকুরমার কাছে শুনিয়াছি, আমাদের গ্রামে আগে কুড়ি পঁচিশ ঘরে মায়ের প্রতিমা আসিত, এখন একটী ঘরেও আসে না! কেহ পূজা করিতে পারে না বলিয়া মায়ের পূজা হয় না। কেহ করিতে চায় না বলিয়া হয় না! আবার এখন এমন লোক অনেক হইয়াছে যাহারা মাকে মানে না, ঋষিবাক্যে বিশ্বাস করে না।"

তা হউক, মা আসেন। আমাদের গ্রামে গ্রামে আসেন, ঘরে ঘরে আসেন। যে ভক্তি করে, তাহার ঘরেত আসেনই, যে ভক্তি করে না, অথবা মাকে মানে না তাহার ঘরেও আসেন। তোমরাত জাননা, তোমাদের হৃদয়ই এক একটী মায়ের ঘর। তোমরা এত

কাল খোঁজ কর নাই। বর্ষেবর্ষে শরৎকালে খোঁজ করিয়া দেখিও, তা' হ'লেই বুঝিতে পারিবে।

হয়ত কেহ বলিবে, "মা কি শুধু আশ্বিনেই আসেন, আর সারা বৎসরটার ভিতরে এক-বারও আসেন না?" তা কেন—মা নিত্যা—সর্ব্বদাই আমাদের হৃদয়ে আছেন। কিন্তু আমরা সকলে সব সময়ে তাতো বুঝিতে পারি না! কিন্তু আমাদের উপর মায়ের কি কৃপা! কেন তা জানি না, এ কৃপা কতদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে তাও জানি না। কতদিন চলিবে তাও বলিতে পারি না—সমস্তই মায়ের ইচ্ছা—কোন যুগ যুগান্তর হইতে বাংলার উপর মায়ের এই কৃপা চলিয়া আসিতেছে। এ কৃপা যেন বাংলার নিজস্ব। তাই মায়ের কথা আজ তোমাদের কাছে বলিতে আসিয়াছি।

বঙ্গভূমি শ্যাম বসন পরিয়া, কুমুদ কহ্লারে কবরী সাজাইয়া, জলে জলে তরঙ্গ তুলিয়া মাকে

আবাহন করেন। চারিদিকে পুষ্পরূপে আনন্দ ফুটিয়া উঠে। স্থলে বায়ুভরে আন্দোলিত ফুল, জলে তরঙ্গভরে কম্পিত ফুল, আর তোমরা নবপ্রাণভরে সচল ফুল। এই সকল ফুলের ডালা লইয়া বঙ্গভূমি প্রতিশরতে মা দুর্গার আগমন প্রতীক্ষা করেন।

মানুক আর নাই মানুক, বঙ্গবাসী হিন্দু মুসলমান পার্শী খৃষ্টান সকলেই এই সময়ে যথাশক্তি আনন্দ অর্জ্জন করিয়া থাকে।

যে ঠাকুর গড়িয়া মায়ের পূজা করে, সে আনন্দ পায়; যে না গড়িয়া পূজা করে সেও আনন্দ পায়। যে মাকে ভক্তি করে না সেও পায়; যে মাকে বিদ্বেষ করে সেও আনন্দ পাইয়া থাকে। কেহ ধর্ম্মে, কেহ অর্থে, কেহ কামনাপূরণে, কেহ আত্মীয় সন্দর্শনে—কেহ দানে, কেহ গ্রহণে—সকলেই অল্পাধিক আনন্দের অধিকারী হইয়া থাকে। তুমি নব সাজে সাজিয়া আনন্দ পাও, তোমার পিতা

মাতা তোমাকে সাজাইয়া আনন্দ লাভ করেন।

আনন্দ—আনন্দ—আনন্দময়ীর আগমনে চারিদিকে কেবল আনন্দস্রোত! আজ আমি তোমাদিগকে সেই আনন্দময়ীর সমাচার উপহার দিব।

(২)

অতি পূর্ব্বকালে আমাদের দেশে সুরথ নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি প্রজাদিগকে পুত্রের ন্যায় পালন করিতেন। সেই জন্য তাঁহার রাজ্যে প্রজাগণের সুখের অবধি ছিল না।

রাজা ধার্ম্মিক হইলে প্রজারাও ধার্ম্মিক হয়।

এই দুয়ে পরস্পরে কেমন একটা সম্বন্ধ আছে। সুরথ রাজার রাজত্বকালে প্রজারা সকলেই ধার্ম্মিক হইয়াছিল। কেহ কাহারও

প্রতি দ্বেষ করিত না; একজন অপরের ধনে লোভ করিত না; সকলেই নিজ নিজ উপার্জ্জনে স্ত্রী, পুত্র, কন্যাগণকে পালন করিত; এবং নিজ নিজ অবস্থাতেই সন্তুষ্ট থাকিত।

অতিথি অভ্যাগত আসিলে গৃহস্থ ভক্তি সহকারে তাহার সেবা করিত। দেবতা ও গুরুজনে তাহাদের অশেষ ভক্তি ছিল।

ধার্ম্মিকের প্রতি দেবতারা প্রসন্ন হন। দেবতা প্রসন্ন হইলে সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতিও প্রসন্না হইয়া থাকেন।

এই জন্য সুরথ রাজার রাজত্ব কালে প্রজাগণ সুখী ছিল। সময়ে দেশে সুবৃষ্টি হইত, সুবর্ণবর্ণ শস্যভারে পৃথিবী সর্ব্বদা ভরিয়া থাকিত। আধিব্যাধি, দুর্ভিক্ষ মহামারী এসব কিছুই ছিল না। গৃহস্থের ঘর ধনধান্যে সর্ব্বদাই পূর্ণ থাকিত। গাভী সকল প্রচুর দুগ্ধ দান করিত। নদী সকল দিয়া সকল সময়েই

নির্ম্মল জল প্রবাহিত হইত; দিঘীসরোবর সকল মৎস্যে পূর্ণ থাকিত। জলের উপরে জলচর পক্ষী সকল তরঙ্গের সঙ্গে নৃত্য করিত। গাছে গাছে পাখীর গানে আকাশ ভরাইয়া দিত। সেই গানের সুরে সুর বাঁধিয়া সুস্থ বালক বালিকা সকল, সুমধুর গানে ও নৃত্যে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে আনন্দের ধারা প্রবাহিত করিত।

কিন্তু দেশের এ সুখের অবস্থা বেশি দিন রহিল না। রাজা সুরথের মনে অহঙ্কার জন্মিল। প্রথমে তিনি নিজে মাঝে মাঝে নগর হইতে বাহির হইয়া প্রজাদের অবস্থা দেখিয়া আসিতেন। তিনি যেখানেই যাইতেন, সেই থানেই দেখিতেন, প্রজারা সুখী আছে। যদি কোনও সময়ে কোথাও কোন প্রজার অসুখের কারণ হইত, রাজা তখনই তাহার প্রতীকার করিতেন। রাজার দৃষ্টির ভয়ে বিপদ প্রজাদের ঘরে প্রবেশ করিতে সাহস করিত না।

এইরূপে কিছুকাল নিজে পরীক্ষা করিয়া রাজা যখন দেখিলেন, প্রজার গৃহে আর অমঙ্গলের চিহ্নমাত্র নাই; যখন গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে কেবল শান্তি ভিন্ন আর কিছুই তিনি দেখিতে পাইলেন না, তখন তিনি মনে করিলেন, এইবারে আমার বিশ্রাম লইবার সময় আসিয়াছে। এই মনে করিয়া তিনি পাত্র, মিত্র, অমাত্য, ভৃত্য এই সকলের উপর প্রজাদের তত্ত্ব লইবার ভার দিয়া কিছুদিনের জন্য পুরমধ্যে বাস করিতে লাগিলেন। পাত্রমিত্রেরাই তাঁহার হইয়া রাজ্য করিতে লাগিল। তিনি এক একবার পুরমধ্য হইতে বাহির হইয়া তাহাদের কাছে প্রজাদের সংবাদ লন, তাহারা একবাক্যে বলে প্রজারা বেশ সুখে আছে। তিনি শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়া আবার বাটীর মধ্যে প্রবেশ করেন।

কিন্তু তা কি কখন চলে! তোমার ঘর তোমার সংসার তুমি না দেখিলে, না দেখিয়া

শুধু চাকর বাকরের উপর ভার দিলে, কখন কি সংসার সুশৃঙ্খলে চলে! রাজ্য হইতেছে রাজার সংসার। সমস্ত প্রজা তাঁর সন্তান। তিনি প্রজা সকলকে যে চক্ষে দেখিবেন, অন্যে সেরূপ দেখিবে কেন? তাহার উপর রাজা ভগবানের অংশ। তিনি মহতী দেবতা—কেবল মানুষের রূপ ধরিয়া থাকেন। মানুষের রূপ ধরিয়া রাজ্যের মঙ্গল বিধান করেন। তিনি যে দিকে যে বিষয়ে দৃষ্টি দিবেন, সেইদিকে সেই বিষয়েরই কল্যাণ হইবে। রাজা সুরথ পূর্ব্বে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যাইয়া প্রজাদের অবস্থা দেখিতেন। যখন তিনি প্রজাদের প্রতি স্নেহ-নয়নে দৃষ্টিপাত করিতেন, তখনই দেশের যত অকল্যাণ—মারীভয়, অন্য রাজার ভয়, চোর-ভয়, অগ্নিভয়—সব দূরে পলাইয়া যাইত। এখন ত আর তাহা নাই! রাজা প্রাসাদের ভিতরে থাকেন, সুতরাং কর্ম্মচারীরা নিজেরা যাহা ভাল বুঝিতে লাগিল তাহাই করিতে

লাগিল। পাত্র মিত্র সকলেইত আর খাঁটী লোক হইতে পারে না। সুতরাং সকলে ধর্ম্ম বজায় রাখিয়া কাজ করিতে পারিল না। কাজেই লুকাইয়া লুকাইয়া রাজ্যে অকল্যাণ প্রবেশ করিতে লাগিল।

দেশে একবার পাপ প্রবেশ করিলে দেশবাসী সকলকেই সেই পাপ অল্পবিস্তর স্পর্শ করে। রাজা হইতে আরম্ভ করিয়া তুচ্ছ প্রজা কেহই আর পূর্ব্বের মত ধার্ম্মিক রহিল না। রাজা ক্রমে কর্ম্মচারীদের চাটুবাক্যের বশীভূত হইলেন, কর্ম্মচারীরা এক বলিয়া এক করিতে লাগিল; প্রজাদের মধ্যে পরস্পরে আর সেরূপ সদ্ভাব ভালবাসা রহিল না।

এমনি সময়ে এক অধার্ম্মিক অনাচার রাজা,-কোথা হইতে আসিয়া, তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিল। সেই অধার্ম্মিক রাজার সৈন্যগণও অনাচার। তাহারা রাজার সঙ্গে

দলে দলে সুরথের দেশে প্রবেশ করিতে লাগিল। সহস্র সহস্র, লক্ষ লক্ষ, কোটী কোটী সেই অনাচার রাজার অনাচার প্রজা আমাদের দেশ ছাইয়া ফেলিল। ঋষিরা তাহাদিগকে যবন বলিয়াছেন। তাহারা নানা অখাদ্য খাইত, হিন্দুর পবিত্র আহারে তাহাদের রুচি হইত না।

দেশের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই তাহারা নিরীহ প্রজাদের উপর অত্যাচার আরম্ভ করিল। তাহারা এক ঘর হইতে অন্য ঘর, এক গ্রাম হইতে অন্য গ্রাম, এক নগর হইতে অন্য নগর, আগুন দিয়া পুড়াইতে লাগিল। শস্যের ভাণ্ডার লুণ্ঠন করিল, দুগ্ধবতী গাভী সকলের প্রাণবধ করিতে লাগিল। রাজ্য মধ্যে হাহাকার পড়িয়া গেল। রাজা সুরথ ভীরু ছিলেন না। তিনি এই উৎপাতের সংবাদ পাইয়াই, নিজের সৈন্য সামন্ত লইয়া শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে গমন করিলেন। রাজার

লোকবল বেশি ছিল। এই যবন রাজ তাঁহার আক্রমণ সহ্য করা অসম্ভব মনে করিল, তাই সে সম্মুখ যুদ্ধ করিতে সাহস করিল না। সে বুঝিল, কৌশলে রাজাকে হারাইতে না পারিলে চলিবে না। রাজার কর্ম্মচারীদের উৎকোচ দিতে লাগিল। শুধু তাই নয়, লুকাইয়া লুকাইয়া প্রজাদের ভিতরে বিবাদ বাধাইয়া দিল।

যখন রাজার কর্ম্মচারীদের ধর্ম্মবল গেল, আর প্রজারা পরস্পর বিদ্বেষ করিয়া দুর্ব্বল হইল, তখন সে তাহাদিগকে নানালোভে বশ করিয়া আপনার পক্ষ করিয়া লইল। এবং সেই সকল বিশ্বাসঘাতকদিগের সহায়তায় সহজেই রাজা সুরথকে পরাস্ত করিয়া দিল।

ঋষি বলিয়াছেন—"সেই সকল যবনেরা রাজা সুরথের অপেক্ষা বলহীন হইলেও, তাঁহাকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়াছিল।"

পরাস্ত হইয়া রাজা নিজের রাজধানীতে

ফিরিয়া আসিলেন। এবং রাজধানী বেড়িয়া একটু সামান্য মাত্র দেশ লইয়া রাজত্ব করিতে লাগিলেন। কিন্তু শত্রুরা তাঁহাকে সেখানেও থাকিতে দিল না। তাঁহার সেই অধার্ম্মিক দুরাত্মা অমাত্য সকল তাঁহাকে দুর্ব্বল বুঝিয়া, তাঁহার হাতীঘোড়া, টাকাকড়ি সব লুঠিয়া লইল, এবং তাঁহাকে একবারে ক্ষমতাহীন করিয়া ফেলিল।

এরূপ অবস্থায় তিনি আর দেশে কেমন করিয়া থাকিতে পারেন! ক্ষমতা গিয়াছে, ধন গিয়াছে, শুধু প্রাণটী এখনও যাইতে বাকী আছে। রাজা প্রাণ রাখিতে ঘর ছাড়িতে প্রস্তুত হইলেন।

এক দিন শীকারের ছল করিয়া তাঁহার প্রিয় ঘোড়াটীতে চড়িয়া তিনি নগর পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার সাধের রাজধানী পিছনে পড়িয়া রহিল। নগর হইতে বাহির হইয়াই অশ্ব তাহার প্রভুকে পৃষ্ঠে লইয়া ছুটিল।

দেখিতে দেখিতে কত গ্রাম কত নগর অতিক্রম করিয়া গেল। সাঁতারিয়া কত নদী পার হইল, কত পর্ব্বত লঙ্ঘন করিল তাহার সংখ্যা রহিল না। দূর দূর—কত দূর গিয়া অশ্ব রাজাকে লইয়া এক গহনবনে প্রবেশ করিল।

(৩)

সেই বনে মেধস নামে এক ঋষির আশ্রম ছিল। রাজা সেই আশ্রমে উপস্থিত হইলেন।

পথে আসিতে আসিতে দেখিলেন, বিধর্ম্মীরা সমস্ত দেশ অধিকার করিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে পাপ দেশটাকে ছাইয়া ফেলিয়াছে। কেবল একটী স্থানে সে প্রবেশ করিতে পারে নাই। সে এই ঋষির আশ্রম।

সে আশ্রমের শোভার কথা তোমাদের কেমন করিয়া বলিব! হৃদয়ে সে ভাব কই? প্রকাশ করিতে পারি, এরূপ কথা কই?

সে ছবি আঁকিয়া তোমাদের নির্ম্মল চক্ষের উপর ধরিতে পারি, এমন ক্ষমতা কই! আমার সে শোভা দেখিবার চক্ষু নাই, বুঝিবার মর্ম্ম নাই, আঁকিবার তুলি নাই। বর্ণপাত্র অভক্তির মসীতে পূর্ণ করিয়াছি, আমি কোন্ সাহসে পবিত্র ঋষির পবিত্র অধিষ্ঠান ভূমির চিত্র তোমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিব? ব্যাঘ্রে ও গাভীতে এক ঘাটে জল খায়, মৃগশিশু সিংহের সহিত খেলা করে, ভেক সাপের ফণায় নৃত্য করে,—এ সকল কথা এখন কে বিশ্বাস করিবে? বৃক্ষ সকল অতিথিকে দেখিয়া শাখা দুলাইয়া আহ্বান করে, কোকিল পাপিয়া গাছ ছাড়িয়া অতিথির স্কন্ধে বসিয়া আবাহনগানে দিক পূর্ণ করে, একথা যে বলিবে লোকে তাহাকে পাগল না বলিয়া কি বলিতে পারে?

লোকে বলে বলুক, তোমরা কিন্তু তোমাদের নির্ম্মল চিত্তে কল্পনায় সেই ছবির একটী

প্রতিবিম্ব তুলিয়া লও ; নিজেরাই চিত্রকর হইয়া আশ্রমের শোভার মর্ম্ম অনুভব কর। তাহা হইলে বড়ই আনন্দ পাইবে। যাহারা এ সব গল্প বলিয়া মনে করে, উপন্যাস বলিয়া প্রচার করে, তাহাদেরই দেশের কত লোক এইরূপ গল্প রচনা করিয়া নিজেরাও আনন্দ ভোগ করিয়াছেন, পাঁচ জনকেও দিয়াছেন। এমন কি আজিও দিতেছেন।

আশ্রমে মেধসমুনি স্থির হইয়া বসিয়াছিলেন। তাঁহাকে চারিদিকে ঘেরিয়া শিষ্যগণ বেদগান করিতেছিল। আশ্রমদ্বারে মৃগ, গাভী, একত্র শুইয়া ছিল। শুইয়া শুইয়া চক্ষু মুদিয়া রোমন্থন করিতে করিতে তাহারা যেন বেদগান শুনিতেছিল। হস্তী গানের তালে শুণ্ড দুলাইতেছিল, সিংহ অতি উল্লাসে কেশর কম্পিত করিতেছিল, পাখী নাচিতেছিল। এমন সময় রাজা অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইয়া মুনিকে প্রণাম করিলেন।

যিনি ঋষি তিনি তিন কালের খবরই বলিতে পারেন। একস্থানে বসিয়া আছেন, তবু পৃথিবীর কোথায় কি হইতেছে, তাঁহার জানিতে বাকী থাকে না। তিনি চক্ষু মুদিয়াও সমস্ত দেখিতে পান। রাজাকে কখন না দেখিলেও তিনি তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন; এবং তাঁহার কি অবস্থা হইয়াছে বুঝিতে পারিলেন। তিনি রাজার উপযুক্ত অভ্যর্থনা করিলেন, এবং তাঁহার আশ্রমে আতিথ্য গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। মুনির অনুরোধ—রাজা না বলিতে পারিলেন না। তিনি সেই আশ্রমে বাস করিতে লাগিলেন।

কিন্তু এমন শান্তিময় আশ্রমে বাস করিয়াও রাজা মনে শান্তি পাইলেন না। দিবারাত্রি যখন তখন তাঁহার রাজ্যের কথা মনে উঠিতে লাগিল। তাঁহার সেই সোনার দেশ, সেই সোনার দেশে সোনার অট্টালিকা—সেই অট্টালিকার ভিতরের মণিমাণিক্য, অতুল

ধনরাশি, তাঁহার হস্তী, অশ্ব, গো,—ঐশ্বর্য্যের চিহ্ন সমুদায় সবার উপর তাঁর প্রাণ হইতেও প্রিয়তর প্রজা—সকলে এক সঙ্গে প্রবল চিন্তারূপে ভিখারী রাজার মনটাকে আঁকাড়িয়া ধরিল। রাজা তাহাদের ছাড়িতে চাহিলে তাহারা ছাড়িতে চাহিল না।

রাজা কখন ভাবেন—"ভৃত্যগুলা আমার পূর্ব্বপুরুষ হইতে পালিত হইয়া আসিয়াছে। তাহারাই কিনা শেষে বিশ্বাসঘাতক হইয়া আমার রাজ্যকে শত্রুর হাতে ধরিয়া দিল! সেই সকল দুষ্টলোকের হাতে রাজ্যশাসনের ভার পড়িয়াছে। তাহারা কি ধর্ম্মজ্ঞানে রাজ্যশাসন করিবে? তাহারা কি প্রজাদের সুখে রাখিতে পারিবে?" কখন ভাবেন, "আমার সেই প্রিয়হস্তী—আমাকে দেখিলে যে শুণ্ড তুলিয়া, পাহাড়ের মতন প্রকাণ্ড দেহটা দুলাইয়া, আমার কাছে কত আনন্দ দেখাইত, সে কি বৈরীগুলার হাতে পড়িয়া সেরূপ সুখে

আছে? আর কি কেহ তাহাকে সেরূপ করিয়া আদর করে, যত্ন করিয়া আহার দেয়?” কখন চিন্তা করেন—“ভৃত্যেরা পূর্ব্বে আমার অনুগত ছিল। এখন তাহারা উদরের দায়ে অন্য রাজার সেবা করিতেছে। প্রভু ও ভৃত্যের ভিতরে যে মমতা থাকা কর্ত্তব্য, তা তাহাদের নাই। প্রভু ভৃত্যকে বিশ্বাস করিবে না, ভৃত্যও প্রভুর কাজ আর নিজের মত ভাবিয়া করিবে না। যে যার নিজের সুখের জন্য ব্যস্ত থাকিবে। এ উহার মুখ চাহিবে না। কাজেই আমোদপ্রমোদে অগাধ অর্থ ব্যয় হইয়া যাইবে। তাহাতে হইবে কি? সর্ব্বদা ব্যয় করিতে করিতে আমার অতিদুঃখে সঞ্চিত ধনরাশি ক্ষয় করিয়া ফেলিবে।”

রাজা সকল সময়ে কেবল এই প্রকার চিন্তা করিতে লাগিলেন। তোমরা এখনও ভালরূপ জান না চিন্তার শক্তি কি? সে একবার মনকে আশ্রয় করিতে পারিলে,

তাহাকে ত্যাগ করা বড় কঠিন। বরং বাঘ ভালুককে তাড়াইয়া দেওয়া সহজ, কিন্তু চিন্তাকে মন হইতে তাড়াইয়া দেওয়া সহজ ব্যাপার নয়। ঋষিরা বলেন, চিন্তার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া যিনি জয়লাভ করিয়াছেন, তিনিই বড় যোদ্ধা, তিনিই পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীর।

রাজা সুরথ চিন্তার জ্বালায় অস্থির হইলেন। তিনি কখন উঠেন, কখন বসেন, কখন বা তপোবনের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ান। প্রাণে তাঁহার এক মুহূর্ত্তের জন্যও শান্তি রহিল না।

(৪)

এক দিন ঘুরিতে ঘুরিতে তিনি দেখিলেন, সেই মুনির আশ্রম সমীপে একজন লোক তাঁহারই মতন ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সে ব্যক্তিও তাঁহার মত কোন দুঃখী হইবে বিবেচনা

করিয়া, তিনি তাঁহার নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা কহিলেন—“তুমি কে? এখানে তুমি কি জন্য আসিয়াছ? তোমাকে শোকান্বিত ও বিমনার মত দেখিতেছি কেন?”

সে ব্যক্তি বলিল—“আমার নাম সমাধি। আমি জাতিতে বৈশ্য; ধনীবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি।”

রাজা বলিলেন—“তবে তোমার এ দশা দেখিতেছি কেন?”

সমাধি উত্তর করিলেন—“ধনের লোভে আমার স্ত্রী ও পুত্রগণ আমাকে ঘর হইতে বাহির করিয়া দিয়াছে। তাহারা আমার সমস্ত ধন হরণ করিয়া লইয়াছে। তাই মনের দুঃখে আমি বনে আসিয়াছি।”

রাজা ভাবিলেন,—“মন্দ নয়; এ বনেও তাঁহার যোগ্য সঙ্গী মিলিয়াছে!” সেই তপোবনে একমাত্র তিনি ভিন্ন আর সকলেই সুখী। তাহারা যে শুধু সুখী ছিল, তা’ নয়, দুঃখ

যে কাকে বলে তাহাও তাহারা জানিত না। সুতরাং রাজার অবস্থার মর্ম্ম তাহারা কেহই ভালরূপ বুঝিতে পারিত না। রাজা তাহাদের সহবাসে সুখ পাইতেছিলেন না। এইবারে মনের দুঃখ বুঝিবার লোক মিলিয়াছে বুঝিয়া তিনি সমাধিকে পাইয়া আনন্দিত হইলেন। তিনি তাহাকে আশ্বাস দিলেন—"আমিও তোমার মত সর্ব্বস্ব হারাইয়াছি। হারাইয়া এই বনে আসিয়াছি। তা'হলে এস, আমরা দুই জনে পরস্পরের সঙ্গী হইয়া বনে বাস করি।"

সমাধি বলিল—"তাই বা কেমন করিয়া করি! আমি এখানে থাকিয়া পরিবারগণের কোনও সংবাদ পাইতেছি না, কে কেমন আছে কিছুই জানিতে পারিতেছি না।"

রাজা বলিলেন—"যে স্ত্রী, যে পুত্র অর্থ-লোভে তোমাকে দূর করিয়া দিয়াছে, তাহা-দের জন্য তোমার মন স্নেহে আবদ্ধ হইতেছে কেন?"

সমাধি বলিল—"আপনি যাহা বলিলেন, তাহা ঠিক ; কিন্তু কি করি আমার মন ত কিছুতেই এ কথা বুঝিতেছে না ! যাহারা ধনের লোভে আমার মমতা পরিত্যাগ করিয়াছে, আমিত কোনও ক্রমে সেই স্ত্রী-পুত্রের মমতা পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি না। তাহাদের জন্য আমার দীর্ঘনিশ্বাস পড়িতেছে, চিত্ত বিকল হইতেছে। তাহারা আমাকে চায় না, অথচ তাহাদের প্রতি আমার মন কিছুতেই নিষ্ঠুর হইতে পারিতেছে না। কেন যে এরূপ হয়, আমি বুঝিয়াও বুঝিতেছি না— আমি করি কি ?"

সমাধির কথা শুনিয়া রাজার চৈতন্য হইল। তিনি মনে মনে বলিলেন—"তাই ত ! আমিই বা এতদিন কি করিতেছিলাম ! কোথায় আমার রাজ্য, আর কোথায় আমার ধন ? প্রজা প্রজা যে করিতেছি—সেই প্রজাই বা আমার কোথায় ? রাজ্য শত্রুতে

লইয়াছে, অমাত্যগণ বিদ্রোহী হইয়াছে, প্রজাগণ এখন তাহাদের আশ্রয় করিয়াছে। সেখানে আমার বলিবার আর কিছু নাই। তবু আমি আমার আমার করিয়া তাহাদের চিন্তায় পাগল হইতেছি কেন?

(৫)

রাজা সমাধিকে সঙ্গে লইয়া মুনির নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং তাঁহাকে প্রণাম করিয়া প্রশ্ন করিলেন,—"ভগবন্! আমি আপনাকে একটি রহস্য জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি, উপদেশ দিয়া সেটি আমাকে বুঝাইয়া দিন। মনকে বশ করিতে না পারায় আমার যে দুঃখ হয়, ইহার কারণ কি? আমার রাজ্য শত্রুতে অধিকার করিয়াছে। বুঝিতেছি, দুঃখ করিলে তাহাকে ফিরিয়া পাইব না, তথাপি সে রাজ্যের প্রতি আমার মমতা যাইতেছে না, ইহারই বা কারণ কি? এই বৈশ্যের পুত্রগণ,

স্ত্রী, ভৃত্যগণ সকলে মিলিয়া ইহাকে গৃহ হইতে বাহির করিয়া দিয়াছে। ইহার বন্ধুগণের কেহই এই দুঃসময়ে ইহাকে তাহাদের ঘরে স্থান দেয় নাই; অথচ এই ব্যক্তি তাহাদের জন্য স্নেহে ব্যাকুল হইয়া রহিয়াছে। আমরা বুঝিতেছি আমাদের নিজের বলিয়া কিছুই নাই, তবু আমরা দু'জনেই আমার আমার করিয়া অস্থির হইতেছি, ইহারই বা কারণ কি? আমাদের উভয়েরই ত জ্ঞান আছে! যাহারা অজ্ঞান, তাহারাই ত এইরূপ দুঃখ করে, তবে আমরা করিতেছি কেন?"

ঋষি রাজার এই প্রশ্নে যে উত্তর করিয়াছিলেন, তাহা সমস্ত বলিলে তোমাদের পক্ষে বুঝা কঠিন হইবে। শুধু তোমাদের কেন, আমাদের দেশে এখন কয়জনই বা এমন জ্ঞানী আছেন যে, ঋষিগণের পবিত্র উপদেশ বুঝিতে পারেন? বুঝিতে পারিলে আমাদের এত দুর্দ্দশাই বা হইবে কেন? কেহ বুঝিতে

পারেন না, কেহ বা বুঝিতে চেষ্টা করেন না। ফলে, প্রায় সকলেই ঋষিবাক্যে অবিশ্বাস করিয়া নিশ্চিন্ত হন। সুতরাং ঋষি যাহা বলিয়াছিলেন, আমি তোমাদের তাহার সামান্য ভাবার্থ শুনাইব।

ঋষি বলিলেন—"তোমাদের জ্ঞান আছে, এ কথা কে বলিল ?"

রাজা বলিলেন—"কেন প্রভু, আমাদের মন যে বলিতেছে !"

ঋষি বলিলেন—"মহারাজ! তোমাদের যে জ্ঞান, এ জ্ঞান পশুপক্ষীতেও আছে! তবে তোমরা যদি জ্ঞানী হও, তাহ'লে তাহারাই বা জ্ঞানী হইবে না কেন ?"

একি কথা! ঋষির মতে পশু ও আমরা সমান হইলাম! কথাটা ত বড় কঠিন হইয়া দাঁড়াইল! অথচ পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ঋষিরা ভুলেও মিথ্যা কহিতে জানিতেন না। তবে আমরা এতকাল যে জ্ঞানের অহঙ্কার

করিয়া আসিতেছি, সেটা কি জ্ঞানই নয়? মুনিবর মেধস রাজাকে বলিতে লাগিলেন—"মনুষ্যগণ জ্ঞানী ইহা সত্য বটে, কিন্তু কেবল তাহারাই যে জ্ঞানী এমন নয়। পশু, পক্ষী, মৃগ প্রভৃতি সকলেরই জ্ঞান আছে। ইহাকেই সাধারণ জ্ঞান বলে। ইহা মানুষেরও যেরূপ, ইতর প্রাণিগণেরও সেইরূপ। মা যেমন ক্ষুধায় কাতর হইলেও, ক্ষুধার্ত্ত সন্তানের মুখে আহার না দিয়া নিজে আহার করেন না, পক্ষিগণও সেইরূপ করিয়া থাকে। সামান্য জ্ঞানসত্ত্বেও ইহারা শাবকদের প্রতি কেমন মমতা দেখায় দেখ। নিজে ক্ষুধায় কাতর, তথাপি শাবকের চঞ্চুতে নিজের মুখের আহার তুলিয়া দিতে ব্যগ্র হইয়া থাকে! "আমরা যেমন সন্তানগণকে পালন করিতেছি; আমাদের বৃদ্ধ বয়সে, যখন আমরা অশক্ত হইব, তখন সন্তানগণও আমাদিগকে এই ভাবে পালন করিবে," এই

আশাতেই না লোকে পুত্রগণের প্রতি মমতা দেখাইয়া থাকে, ইহা কি দেখিতে পাও না ?"

অনেকেই হয় ত বলিবেন—"একি কথা! কবে পুত্র আমাদের ভরণপোষণ করিবে, অশক্ত দেখিয়া সেবা করিবে, এই আশাতেই কি আমি প্রাণপাত করিয়া পুত্র কন্যাদের পালন করিতেছি ?" অনেক মা হয়ত বলিবেন—"আমার গোপাল আবার বাঁচিবে! বাঁচিয়া আমার সেবা করিবে! সে বাঁচিয়া সুখী থাকে, আমি দেখিয়া মরি। তাহার সেবায় আমার কাজ নাই; আমি সেবা করিতে হয় করিয়া যাই। তবে ঋষি সুরথরাজাকে যে কথা বলিলেন, এ কথা কেমন করিয়া বিশ্বাস করিব ?"

আমাদের অল্পজ্ঞান, আমরাই বা কেমন করিয়া ইহার উত্তর দিব ? ইহার উত্তরে আমি এই মাত্র বলিতে পারি, নিজে নিজেকে জিজ্ঞাসা করিলেই, এ প্রশ্নের উত্তর মিলিবে। এ উত্তর প্রশ্ন কর্ত্তা নিজে যেমন দিতে

পারিবেন, অন্যে সেরূপ পারিবে না। সাধুরা বলেন, সাধারণ মানুষের যে অপরকে ভালবাসা সে নিজের সুখের জন্য, পরের জন্য নয়। ভাই নিজেকে ভালবাসেন বলিয়াই ভাইকে ভালবাসেন; পিতা ও মাতা আত্ম-প্রীতির জন্যই সন্তানকে স্নেহ মমতা দেখাইয়া থাকেন।

যিনি শুধু ভালবাসিবার জন্যই তাঁহার ভাই ভগিনীগুলিকে ভালবাসেন, তিনি আমাদের সকলেরই ভাই; যে পিতা ও যে মাতা শুধু পুত্র কন্যারই মঙ্গলার্থে তাহাদের প্রতিপালন করিয়া থাকেন, তাঁহারা সাধারণেরই জনক জননী। তাঁহাদের পুত্র কন্যা তাঁহাদের কাছে যেরূপ স্নেহ ও মমতা পাইয়া থাকে, আমরা যদি কখন তাঁহাদের দ্বারস্থ হই, তাহা হইলে আমরাও সেইরূপ স্নেহমমতা তাঁহাদের কাছে পাইবার প্রত্যাশা করি। সুখে আনন্দ, দুঃখে শান্তি—এই

মমতা-ফুলের ডালা তাঁহারা শুধু তাঁহাদের ছেলে মেয়েদের জন্য তুলিয়া রাখেন নাই। অনাথ, আতুর যে কোন অতিথি যখনই তাঁহাদের দ্বারে উপস্থিত হউক না কেন, তখনই তাহারা সেই অঞ্জলিভরা কুসুম-সৌরভে মত্ত হইয়া আসে। ইহার নাম দয়া।

সাধারণতঃ যাহার আকর্ষণে আমরা পুত্র কন্যা সহোদর আত্মীয়স্বজনকে আপনার করিয়া লইয়াছি, তাহার নাম মায়া। এই মায়াই জগতের সমস্ত জীবকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে।

রাজা সুরথ ঋষির তীব্রবাক্যে ক্ষুব্ধ হইলেন না। তিনি সেই মহাপুরুষের সত্যতায় বিশ্বাস করিয়া করযোড়ে বলিলেন—কেন এমন হয়? কে প্রভু এরূপভাবে আমাদিগকে সংসারে লিপ্ত করিয়াছে?

ঋষি বলিলেন—"মহামায়া। তিনি আদ্যা-শক্তি। তিনিই এই জগৎকে মোহিত করিয়া

রাখিয়াছেন। মহারাজ! এই মোহ বিষয়ে বিস্ময় বোধ করিও না। এই মোহ অথবা মায়া আমাদিগকে সংসার বন্ধনে জড়াইয়া রাখিয়াছে।”

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন—“হে ভগবন্! যাঁহাকে আপনি আদ্যাশক্তি মহামায়া বলিতেছেন, তিনি কে?”

সংসারের জ্বালায় জর্জরিত হইয়া মানুষ যখন শান্তির জন্য লালায়িত হয়, যখন স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, ঘর, বাড়ী, টাকাকড়ি, মানসম্ভ্রম কিছুতেই সুখ না পাইয়া সুখের একটি অক্ষয় ভাণ্ডার খুঁজিবার জন্য সচেষ্ট হয়, তখন তাহার মনে সময়ে সময়ে একটি প্রশ্ন উঠে। “আমি সংসারে সুখ চাই; কিন্তু তার পরিবর্ত্তে জ্বালা পাই কেন? আমি শীতল হইতে এদেশে আসি; কিন্তু আসিয়া তাপে জর্জরিত হই কেন?

প্রথম প্রথম মনে এই প্রশ্ন উঠিতে না

উঠিতে আমরা আবার সংসারের মমতাসাগরে ডুবিয়া যাই। আবার যখন শ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হয়, তখন তরঙ্গের উপর মাথা তুলিয়া আবার এই প্রশ্ন করি। ক্রমে যখন এরূপ মনে হয় যে, এই প্রশ্নের যথার্থ উত্তর না পাইলে আমাদের আর নিস্তার নাই, তখন কোন এক অভাবনীয় অচিন্তনীয় শক্তি কোথা হইতে কেমন করিয়া, আমাদিগকে এক পরমাত্মীয়ের নিকটে আনিয়া উপস্থিত করে! সেই মধুময় পরমাত্মীয় জ্ঞানরত্নের উপহার লইয়া, কোন্ অনাদিকাল হইতে যে এক নিভৃত নিকুঞ্জে আমাদের অপেক্ষায় বসিয়া আছেন, তাহা তিনি ভিন্ন আর কেহ বলিতে পারে না। আমাদের শাস্ত্রে তাঁহার নাম গুরু। আমরা প্রাণের আগ্রহে যখন শ্রীগুরুদেবের নিকটে পূর্ব্বোক্ত প্রশ্ন করি, তখন তাঁহার কৃপায় মহামায়া যে কে, তাহার আভাষ পাই। আমাদের যাহার যেমন আগ্রহ, আমরা তদনু-

যায়ী সময়ের মধ্যে শ্রীগুরুর শ্রীপাদপদ্মসমীপে উপস্থিত হইয়া থাকি। যে অতি ব্যাকুল, সে শীঘ্রই তাঁহার সন্ধান পায়, যে অল্প ব্যাকুল, তাহার সন্ধান পাইতে কিছু বিলম্ব ঘটে। আসল কথা, প্রাণে বিষম ব্যাকুলতা না জাগিলে তাঁহার সন্ধান মিলে না।

প্রথম প্রথম সুরথ রাজা মেধস মুনির আশ্রমে গিয়াও শান্তি পান নাই। তাঁহার দর্শন পাইয়াও রাজা তাঁহাকে চিনিতে পারেন নাই। যে অন্ধ তাহার চোখের উপর দিয়া সর্ব্বজ্যোতির আধার সূর্য্য চলিয়া গেলেও সে তাঁহাকে দেখিতে পায় না। বিষয়ের প্রতি মমতা রাজার বুদ্ধিটিকে ঢাকিয়া রাখিয়াছিল, তাই মেধসের মহিমা তিনি প্রথমে বুঝিতে পারেন নাই। সমাধির কথা শুনিয়া তাঁহার যখন কিঞ্চিৎ চৈতন্য হইল, আর মুনির কথায় যখন তাঁহার চোখ ফুটিল, তখন তিনি বুঝিলেন, শান্তি ধন সেই বাকল পরা ভিখারীরই কাছে

লুকান রহিয়াছে। সেই শান্তির লোভে রাজা মুনিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ভগবন্! যাঁহাকে আপনি মহামায়া বলিতেছেন—তিনি কে?" ঋষি যে ভাষায় রাজা সুরথকে মহামায়ার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহার কেবল ভাবার্থ আমি তোমাদিগকে বলিব।

ঋষি বলিলেন,"মহামায়া পরমা জননী অর্থাৎ আদিমাতা। যখন এই জগৎ ছিল না,তখন তিনি ছিলেন। যখন সূর্য্য ছিল না, চন্দ্র ছিল না, তারা নক্ষত্র এই পৃথিবী কিছুই ছিল না, তখন তিনি ছিলেন। তাঁহা হইতেই এই জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। তিনি এই জগৎকে মোহিত করিয়া রাখিয়াছেন বলিয়া তাঁহার নাম মহামায়া। জগৎকে তিনি সৃষ্টি করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই তিনি জগৎকে ধরিয়া আছেন, এই জন্য তাঁহার আর এক নাম জগদ্ধাত্রী। তিনি ধারণ করিয়া না থাকিলে উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গেই এ জগতের লয় হইয়া

যাইত। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তিনি নিত্যা—অর্থাৎ সর্ব্বদাই তিনি বর্ত্তমান আছেন। এই জন্য তাঁহার আর এক নাম সনাতনী। তিনি এই জগতের রাণী। মনুষ্য হইতে আরম্ভ করিয়া এই পৃথিবীতে যত জীব আছে, ইহাদের ত কথাই নাই, এ জগতে স্বর্গে-মর্ত্ত্যে পাতালে যেখানে যত জীব আছে—দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ-রক্ষ সমস্তই তাঁহার প্রজা। এইজন্য তাঁহার আর এক নাম ঈশ্বরী।

ঋষি রাজা সুরথের কাছে মহামায়ার যে পরিচয় দিলেন, তাহা সকলে বুঝিলে কি? তোমাদের মধ্যে অনেকেই বলিবে, অনেকেই কেন, প্রায় সকলেই বলিবে, কিছুই বুঝিলাম না। না বুঝাই সম্ভব। সুরথরাজা নিজে জ্ঞানী ছিলেন, এইজন্য মুনি তাঁহাকে জ্ঞানীর মনোমত উপদেশ দিয়াছিলেন।

আমাদের দেশে এখন এমন জ্ঞানী অল্পই আছেন, যাঁহারা মেধস মুনির এই কয়েকটী

কথা বুঝিতে পারেন। তাহা হইলে এ উপদেশ ত আমাদের পক্ষে কার্য্যকর হইল না! আমরা যাহা জানিতে চাহিলাম, তাহা ত জানিতে পারিলাম না!

তাহা নয়। ঋষি সুরথরাজাকে শুধু ওই উপদেশ দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ঋষিরা যাহা বলেন, যাহা করেন, সমস্ত জীবের মঙ্গলের জন্য। সেই মঙ্গলময় ব্রাহ্মণ শুধু কি সুরথকে বুঝাইবার জন্যই উপদেশ দিয়াছিলেন? পার্শ্বে তাঁর নির্ব্বাক বৈশ্য সমাধি আগ্রহসহকারে উপদেশ শুনিতেছিল। সংসারে আবদ্ধ অথচ মুক্তিপ্রয়াসী কত জীব, আপন আপন ঘরে বসিয়া ঋষিবাক্য শুনিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিল। ঋষি জানিতেন, তাহারা ত সুরথের মত জ্ঞানী নয়! ঋষি জানিতেন, দূর ভবিষ্যতে অনন্ত কাল সাগরের পারে, এই কলিযুগের সংসারে, কত লোক তাঁহার উপদেশ শুনিবার জন্য কান পাতিয়া থাকিবে।—তাহারাও

ত সুরথের মত জ্ঞানী নয়! ঋষির সেই মধু-ময়ী বাণী আকাশতরঙ্গে নাচিয়া নাচিয়া যখন তাহাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিবে, তখন ত তাহারা তাঁহার সেই উপদেশের মধুর ঝঙ্কারের মর্ম্ম বুঝিতে পারিবে না!

ঋষি তাহা বুঝিয়াছিলেন। বুঝিয়া, রাজা সুরথকে উপদেশ দিবার ছলে, সমস্ত জগতের জীবকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন, "ভক্ত! আশ্বস্ত হও। সেই সর্ব্বেন্দ্রিয় প্রকাশিকা আদ্যাশক্তি, জগতের আদি জননী নারায়ণী, ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবেরও ঈশ্বরী শঙ্করী সময়ে সময়ে এই মর্ত্ত্যলোকে আবির্ভূতা হন।" তাঁহার রচিত সংসারটীকে নষ্ট করিবার জন্য মাঝে মাঝে এই পৃথিবীতে দানবের উৎপাত হয়। তখন ধর্ম্মের ক্ষয়, আর অধর্ম্মের বৃদ্ধি হয়। বৃদ্ধি পাইতে পাইতে যখন অধর্ম্মের ভার এত অধিক হয় যে, মা ধরিত্রী আর তাহা সহ্য করিতে পারেন না, তখন তিনি কাঁপিতে থাকেন ও

কাঁদিতে থাকেন। সেই রোদনের সঙ্গে সঙ্গে সারা গগন ব্যাপিয়া, সমস্ত দেব-হৃদয় কাঁপাইয়া মায়ের মধুর নামের ধ্বনি উঠে। ধরিত্রীর সঙ্গে সঙ্গে দেবতারা যখন সমস্বরে মাকে আবাহন করিতে থাকেন, তখন জগজ্জননী আর স্থির থাকিতে পারেন না। তখন সাধু-দের পরিত্রাণের জন্য, অসাধুদের ধ্বংসের জন্য, সনাতন ধর্ম্ম রক্ষা করিবার জন্য সনাতনী মা আমাদের মধ্যে আসিয়া অবতীর্ণা হন। শক্তিরূপা সনাতনী আপনার বিশ্ব-বিমোহিনী মায়া দ্বারা আপনাকে আচ্ছাদিত করিয়া নারীরূপে আমাদের মধ্যে লীলা করিতে আসেন।

তখন তিনি পিতা মাতার কাছে নন্দিনী, ভ্রাতার কাছে ভগিনী, পতির কাছে জায়া, পুত্র কন্যার কাছে জননী। তখন তিনি দীনের কাছে দয়া; তৃষিতের কাছে জল, রোগীর কাছে সেবা, ক্ষুধিতের কাছে ফল। তখন

কত মূর্ত্তিতে যে মা আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হন তাহা আর তোমাদের কি বলিব ? তাঁহার গুণ বর্ণনা করিয়া শেষ করিতে পারে, এমন শক্তি এ জগতে কার আছে ?

তিনি আসিলেই জীবের সকল দুর্গতির অবসান হয়। এইজন্য তাঁহার আর এক নাম দুর্গা। দুর্গতি নাশিনী দুর্গাই মহামায়া। ভক্তি সহকারে তাঁহার বিচিত্র কাহিনী শুন, তাহা হইলেই তিনি কে, আমাদিগের সঙ্গে তাঁর কি সম্বন্ধ বুঝিতে পারিবে।

মুনি কহিলেন—"মহারাজ ! জগৎ রক্ষার জন্য তিনি এক একবার অবতীর্ণা হন।"

সুরথ জিজ্ঞাসা করিলেন—"ভগবন্! কোন্ কোন্ সময়ে তিনি অবতীর্ণা হইয়াছিলেন ?"

মুনি মহামায়ার চরিত্র বর্ণনে প্রবৃত্ত হই-লেন।

(৬)

একবার মধু ও কৈটভ নামে দুই ভয়ঙ্কর অসুর সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মাকে গ্রাস করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছিল।

বিষ্ণু তখন অনন্ত শয্যায় শুইয়াছিলেন। এক মহাসাগরে সমস্ত জগৎটা নিমগ্ন হইয়াছিল। ব্রহ্মা বিষ্ণুর নাভি-কমলে বসিয়া জগৎটাকে আবার কেমন করিয়া গড়িবেন, সেই চিন্তা করিতেছিলেন। এমন সময়ে দেখিলেন, দুইটা ভয়ঙ্কর দৈত্য হাঁ করিয়া তাঁহার দিকে ছুটিয়া আসিতেছে।

তাহাদের মাথা দুইটা আকাশে ঠেকিয়াছে, চারিটা হাত চারিটা দিক অধিকার করিয়াছে। অত বড় গভীর সাগরে তাহাদের হাঁটু ও পর্য্যন্ত ডুবাইতে পারে নাই। সেই আকাশে ঠেকা মাথায় আকাশ জোড়া হাঁ! তাহার ভিতরের দাঁতগুলা এক একটা পাহাড়ের মত!

ব্রহ্মা তাহাদের মূর্ত্তি দেখিয়া ভীত হইলেন। মনে মনে বুঝিলেন, "ইহাদের সঙ্গে আমি ত যুদ্ধ করিতে পারিব না।" এই ভাবিয়া তিনি বিষ্ণুকে ডাকিতে লাগিলেন। বলিলেন, "হরি! উঠ; দৈত্য ভয়ে আমি ভীত হইয়াছি।"

হরি যোগ নিদ্রায় মগ্ন ছিলেন। সুতরাং ব্রহ্মার কথা তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল না। অসুর দুইজন ক্রমেই নিকটে আসিতেছে দেখিয়া ব্রহ্মা মহামায়ার শরণাপন্ন হইলেন। মহামায়া যোগনিদ্রারূপে বিষ্ণুর চক্ষু পলক অধিকার করিয়া বসিয়াছিলেন। মহামায়া ইচ্ছা না করিলে ত বিষ্ণুর নিদ্রাভঙ্গ হয় না! তাই ব্রহ্মা মহামায়াকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য তাঁহার স্তব আরম্ভ করিলেন।

ব্রহ্মা করজোড়ে বলিতে লাগিলেন—"মা পরমাজননী জগদ্ধাত্রী! তুমিই যোগনিদ্রারূপে হরির নয়ন কমল আশ্রয় করিয়া আছ। সেই

নয়ন উন্মীলিত করিয়া দাও, হরিকে জাগাও।

স্তব করিতে করিতে ব্রহ্মা দেখিলেন, বিষ্ণুর চক্ষু, মুখ, নাসিকা, বাহুদ্বয় এবং বক্ষদেশ হইতে এক অপূর্ব্ব জ্যোতি বাহির হইল! ক্রমে দেখিলেন, সেই জ্যোতি পুঞ্জীভূত হইয়া অপূর্ব্ব মাতৃমূর্ত্তি ধারণ করিল!

ব্রহ্মা আর কিছু দেখিতে পাইলেন না। মায়ের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে মহামোহে সমস্ত সংসার ভরিয়া গেল। স্বয়ং সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মাও তাহা হইতে নিস্তার পাইলেন না। যোগনিদ্রায় কমলযোনির নয়ন দুটী আবৃত হইল।

এদিকে জনার্দ্দন নিদ্রাভঙ্গে অনন্ত শয্যা হইতে উত্থিত হইলেন। উঠিয়াই তিনি সেই দুই অসুরকে দেখিতে পাইলেন। তাহারাও তাঁহাকে দেখিতে পাইল। দেখিবামাত্র তাহারা ভগবান হরিকে আক্রমণ করিল। বহুকাল ধরিয়া জনার্দ্দনের সঙ্গে সেই দুই

দানবের যুদ্ধ হইল। বহুকাল যুদ্ধ করিয়াও তাহারা পরাস্ত অথবা ক্লান্ত হইল না। তখন মহামায়া তাহাদিগকে মোহ দ্বারা অভিভূত করিয়া ফেলিলেন।

মোহের বশবর্ত্তী হইয়া তাহারা হরিকে কহিল, "তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আমরা বড়ই তুষ্ট হইয়াছি। তুমি আমাদের কাছে বর গ্রহণ কর।"

জনার্দ্দন বলিলেন—"বেশ, তোমরা যদি আমাকে বর দিতে চাও, তা'হলে এই বর দাও, যেন আমার হাতে তোমাদের দুইজনেরই মৃত্যু হয়।"

বর প্রার্থনা শুনিয়াই অসুর দুইটার চক্ষু কপালে উঠিয়া গেল। তাহারা ভাবিল "তাইত! কি করিলাম! ইচ্ছা করিয়া নিজেরাই নিজেদের মৃত্যুকে ডাকিয়া আনিলাম!"

তাহারা একবার চারিদিকে চাহিল।

দেখিল, সমস্ত জগৎ জলরাশিতে ভরিয়া রহিয়াছে। তখন তাহারা মহামায়ার মহামায়াতে মোহিত হইয়াছিল। সেই মায়ার ঘোরে দুই দানব স্থির করিল, হরিকে বরও দিব, অথচ তাহাকে প্রতারিত করিব। এই ভাবিয়া দুইজনে মুখামুখী করিয়া অনেক পরামর্শ করিল। তারপর হরিকে কহিল—"তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া সুখী হইয়াছি। সেইজন্য বরও দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছি। তুমি আমাদের মৃত্যুবর চাহিতেছ। তা ভালই করিয়াছ। তোমার হাতে মরিতে পারিলে আমাদের গৌরব বাড়িবে বই কমিবে না। আমরা মরিতে প্রস্তুত আছি। তবে তুমি এমন স্থানে আমাদের বধ কর, যেখানে জল নাই।"

দানব দুইজন মনে করিল, আমাদের বরও দেওয়া হইল, অথচ প্রাণও রক্ষা হইল। কেননা সমস্ত সংসারের মধ্যে এমন একটুও স্থান ছিল না যেখানে জল ছিল না। জনার্দ্দন

তাহাদের কথা শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন—"তাহাই হউক।"

এই বলিয়া ভগবান নারায়ণ সেই মহাসমুদ্রে আপনার জানুদ্বয় রক্ষা করিলেন। অসুর দুইজন সবিস্ময়ে দেখিল, তাঁহার দুই জানু দু'টী মহাদেশে পরিণত হইয়াছে! তাহাতে মধু ও কৈটভের ন্যায় কত দানবের যে স্থান হয়, তাহার সংখ্যা নাই। ব্যাপার দেখিয়া তাহাদের আর কথা কহিবার শক্তি রহিল না। তখন জনার্দ্দন তাহাদের কেশাকর্ষণ করিয়া উভয়কেই জানুর উপর পাতিত করিলেন, এবং খড়্গাদ্বারা উভয়ের মস্তক ছেদন করিলেন।

সেই দুই দানবের শরীর দুইটা কত বড় ছিল শুনিবে? তাহারা মরিয়া গেলে তাহাদের দেহ হইতে এত মেদ বাহির হইয়াছিল যে, তাহাতে আমাদের এই প্রকাণ্ড পৃথিবীর সৃষ্টি হইয়া গেল! মধুকৈটভের মেদে সৃষ্ট হই-

য়াছে বলিয়া এই পৃথিবীর আর এক নাম মেদিনী। মধুকে বধ করিয়াছিলেন বলিয়া ভগবানের আর এক নাম মধুসূদন।

মধুকৈটভের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে কমল-যোনির নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি চাহিয়া দেখিলেন, মহাসাগরের জলে একটী অপূর্ব্ব সুন্দর দ্বীপ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাই দেখিয়া তিনি আনন্দে জীব-সৃষ্টি করিলেন। দেব, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব, মানব, পশু, পক্ষী প্রভৃতিতে আমাদের এই ধরণী ভরিয়া গেল।

মধুকৈটভের বিনাশ না হইলে পৃথিবীর সৃষ্টি হইত না। হরি না জাগিলে মধুকৈটভের বিনাশ হইত না। মহামায়ার কৃপা না হইলে জনার্দ্দন জাগিতেন না, অনন্ত শয়নেই শুইয়া থাকিতেন। শুধু মায়ের কৃপাতেই আমরা ধরণীতে স্থান পাইয়াছি। এস আমরা সেই মাকে ভক্তিসহকারে প্রণাম করিয়া ঋষি-কথিত তাঁহার দ্বিতীয় বিচিত্র কাহিনী শ্রবণ করি।

(৭)

এবারেও বহু পুরাকালের কথা। তবে মা এবারে অনেকটা আমাদের নিকটে আসিয়াছেন।

প্রথম যখন মায়ের আবির্ভাব হইয়াছিল, তখন এক অনন্ত সাগর মাত্র বিদ্যমান ছিল। সূর্য্য ছিল না, চন্দ্র ছিল না, তারানক্ষত্র কিছুই ছিল না। মানুষ ও জীবজন্তুর কথা ছাড়িয়া দিই, দেবতাদের পর্য্যন্ত তখনও জন্ম হয় নাই। কেবল এক অন্ধকার, বিরাট অন্ধকার সেই অনাদি সময়ে রাজত্ব করিতে-ছিল। সে সময়ের কথা—যখন একমাত্র নারায়ণ অনন্ত শয়নে শুইয়াছিলেন, সেই আদিদেবের সঙ্গে মধুকৈটভের যুদ্ধ—সঙ্গে সঙ্গে আদ্যাশক্তি জগজ্জননী মহামায়ার লীলা—জ্ঞানী মহাত্মা সকলই তাহা কল্পনায় আনিতে অন্ধকারে

ডুবিয়া যান, আমরা ক্ষুদ্র প্রাণী, আমরা ইহার মহদর্থ কি বুঝিব ?

তবে ঋষি-কথিত কাহিনী !—পৃথিবীর এই জন্মকথা শ্রবণে পুণ্য আছে—ভক্তিসহকারে শুনিলে, একদিন না একদিন তোমাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইবে। তখন মহামায়ার কৃপায় তোমরা ইহার অর্থ অনেকটা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে।

দ্বিতীয় যুগে দেবতাদের সৃষ্টি হইয়াছে। ইন্দ্র, বায়ু, বরুণ, কুবের, হুতাশন প্রভৃতি দেবগণ তখন স্বর্গরাজ্য শাসন করিতেছেন। সূর্য্য চন্দ্র তখন নবোল্লাসে আকাশপথে পরিভ্রমণ করিতেছেন। মন্দাকিনী তখনও পর্য্যন্ত মহেশ্বরের জটা অবলম্বনে হিমালয়ের শুভ্রশির স্নাত করিয়া ধরণীতে প্রবাহিতা হন নাই। বিষ্ণুপাদ হইতে উদ্ভূত হইয়া তখনও পর্য্যন্ত তিনি ব্যোম-গঙ্গারূপে আকাশে তরঙ্গ তুলিয়া বিহার করিতেছিলেন। তারাফুল তখন সবে-

মাত্র ফুটিয়া স্বর্গের উদ্যান নন্দনে শোভা পাইতে-ছিল, এমন সময় দেবরাজ্যে অসুরের উৎপাত আরম্ভ হইল।

এবারকার অসুররাজের নাম মহিষাসুর। তাহার সহিত দেবগণের একশত বৎসর ধরিয়া যুদ্ধ হইয়াছিল। যুদ্ধে দেবতারা পরাজিত হইলেন। স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল অসুরদের অধিকারভুক্ত হইল।

অনন্যোপায় হইয়া দেবগণ ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন। ব্রহ্মা আবার তাহাদিগকে বিষ্ণু ও শিবের কাছে লইয়া গেলেন; এবং দেবগণের দুর্গতির কথা তাঁহাদিগকে শুনাইলেন। কমলযোনি বলিতে লাগিলেন,—"প্রচণ্ড মহিষাসুর দেবগণের সমস্ত অধিকার কাড়িয়া লইয়াছে। সূর্য্য, ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, চন্দ্র, যম, বরুণ ও অন্যান্য দেবতাদিগের, এমন কি ঋষিগণের স্থানে সেই প্রচণ্ড অসুর একা আধিপত্য করিতেছে। দেবতারা এখন

তাহার ভয়ে মানুষের মত পৃথিবীতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। মহিষাসুরের কার্য্যকলাপ আপনাদিগের নিকটে কহিলাম। আমরা আপনার শরণ লইলাম। এখন কেমন করিয়া তাহার বিনাশ হয়, সেই উপায় বিধান করুন।

এই কথা শুনিবামাত্র মধুসূদনের বিষম ক্রোধ উপস্থিত হইল। "কি! এতবড় স্পর্দ্ধা! আমার প্রিয় দেবতাদিগের স্থান একটা দুর্ব্বৃত্ত অসুরে অধিকার করিয়াছে!" ক্রোধে তাঁহার সর্ব্বশরীর কম্পিত হইয়া উঠিল।

মধুসূদনের ক্রোধ এ কথাটার একটা গূঢ় অর্থ আছে। জ্ঞানী মহাত্মারা বলেন, শ্রীমধুসূদন জগতের সমস্ত প্রাণীর অন্তরে বিরাজ করিতেছেন। তিনি দেবতাদের ভিতরে যেমন আছেন, তেমনি তোমার ভিতরে, আমার ভিতরে, পশুপক্ষী, তরুলতা প্রভৃতির ভিতরেও আছেন। জগতে এমন জীব নাই, এমন স্থান নাই, এমন দৃশ্য নাই,

যাহার ভিতরে মধুসূদন নাই। এইজন্য হিন্দুরা প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উঠিয়া এই শ্লোকটী উচ্চারণ করিয়া থাকেন। তোমরা সকলে এখনও কর কি না জানি না। যদি না করিয়া থাক, তাহা হইলে নিম্নের লিখিত শ্লোকটী কণ্ঠস্থ করিবে এবং প্রতি প্রভাতে ভক্তিসহকারে মধুসূদনকে প্রণাম করিয়া করযোড়ে শ্লোকটী উচ্চারণ করিবে। কিছু দিন করিলে দেখিবে, তোমাদের আর অসৎকার্য্যে প্রবৃত্তি হইবে না। ভুলেও মুখ হইতে মিথ্যা কথা বাহির হইবে না। শ্লোকটী এই :—

যৎকৃতং যৎ করিষ্যামি তৎসর্ব্বং ন ময়া কৃতং।
ত্বয়া কৃতং তু ফলভুক্ ত্বমেব মধুসূদন॥

যেই কার্য্য নিস্পাদন করেছি মধুসূদন!
যে কার্য্য করিব আমি আর।
নহে মম অনুষ্ঠিত, সে কার্য্য তোমার কৃত;
তুমি প্রভু, ফলভোগী তার॥

তাই বলিতেছিলাম মধুসূদনের ক্রোধের একটি গূঢ় অর্থ আছে। ব্রহ্মা ও দেবতাগণের মর্ম্মকথায় অসুরগণের উপর যেমন তিনি ক্রুদ্ধ হইলেন, অমনি সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত জগৎটা ক্রোধে সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল।

মধুসূদনের সঙ্গে সঙ্গে শিব ক্রুদ্ধ হইলেন; সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মা ক্রুদ্ধ হইলেন; ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ প্রভৃতি সমস্ত দেবতা ক্রুদ্ধ হইলেন। জগতের সমস্ত জীবের ভিতর ক্রোধের সঞ্চার হইল। প্রকৃতি ক্রোধে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল, প্রলয়ঝড়ে আকাশ ব্যাপ্ত হইল, সমুদ্র ক্রোধে ফুলিয়া উথলিয়া উঠিল, স্থির হিমালয়ে অগ্নিশিখা নির্গত হইতে লাগিল, ধরণী কম্পিতা হইলেন।

অতি কোপে মধুসূদনের মুখ হইতে অপূর্ব্ব তেজ নির্গত হইতে লাগিল। তৎপরে ব্রহ্মা ও শঙ্করের মুখ হইতে মহৎ তেজ বহির্গত হইল। সঙ্গে সঙ্গে দেবতাদিগের দেহ হইতে

রাশি রাশি তেজ বাহির হইল। সেই সকল তেজ একত্র হইয়া বিশাল আকার ধারণ করিল। দেবগণ দেখিলেন, যেন এক প্রকাণ্ড শৈল দিগন্তব্যাপিনী অগ্নিশিখায় স্নান করিতেছে।

সেই তেজোরাশি প্রভামণ্ডলে ত্রিভুবন আলোকিত করিয়া দেখিতে দেখিতে এক অপূর্ব্ব নারীমূর্ত্তিতে পরিণত হইল। শঙ্করের তেজে তাঁহার মুখ, বিষ্ণুর তেজে তাঁহার বাহু, ব্রহ্মার তেজে তাঁহার পদ রচিত হইল। এইরূপে অন্যান্য দেবগণের তেজে তাঁহার এক এক অঙ্গ নির্ম্মিত হইল।

আমাদিগের ক্রোধ অনেক সময়ে লোকের অনিষ্ট করিবার জন্যই উৎপন্ন হয়; কিন্তু দেবতাদিগের ক্রোধ জীবের মঙ্গলের জন্যই উৎপন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং সেই সকল তেজ হইতে যে দেহ উৎপন্ন হইল, আদ্যাশক্তি মহামায়া সর্ব্বমঙ্গলারূপে সেই দেহ আশ্রয় করিয়া অবতীর্ণা হইলেন।

মায়ের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে জীবের ভয় ঘুচিয়া গেল; দেবতারা আনন্দিত হইলেন। চারিদিক হইতে মায়ের জয়গান উত্থিত হইল; আকাশগঙ্গায় উল্লাসের বন্যা ছুটিয়া গেল।

তখন মহেশ্বর প্রমুখ দেবগণ মহামায়াকে উপহার দিতে আরম্ভ করিলেন। শিব আপনার শূলের অনুরূপ একটী শূল গড়িয়া মায়ের হাতে দিলেন; কৃষ্ণও স্বীয় চক্রের অনুরূপ একটি চক্র প্রদান করিলেন; ইন্দ্র নিজের বজ্র হইতে আর একটি বজ্র উৎপাদন করিয়া মাকে উপহার দিলেন। এইরূপে দেবতারা নিজ নিজ অস্ত্রের অনুরূপ আর একটি অস্ত্র রচিয়া আদ্যাশক্তিকে রণসাজে সাজাইলেন।

শুধু দেবতা কেন, সমস্ত জগৎ জগদ্ধাত্রীকে সাজাইবার জন্য ব্যগ্র হইল। ক্ষীরোদ সমুদ্র নানাবিধ অলঙ্কারে মায়ের অঙ্গ সাজাইয়া, একখানি অবিনশ্বর বস্ত্র মাকে

পরাইয়া দিল। জল-সমুদ্র একটি সুন্দর শঙ্খ, এক ছড়া প্রফুল্ল পদ্মের মালা ও একটি পরম সুন্দর লীলা-কমল উপহার প্রদান করিল। হিমালয় নিজের সিংহটিকে মায়ের বাহন করিয়া দিল।

(৮)

দেবদত্ত সাজে সজ্জিতা হইয়া, জগতের কল্যাণরূপিণী জননী, অসুরগুলাকে ভয় দেখাইবার জন্য অট্টহাসের সঙ্গে একবার হুঙ্কার করিলেন। সেই ভীমহুঙ্কারে সমুদায় আকাশ মণ্ডল ব্যাপ্ত হইয়া গেল। স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল স্তম্ভিত হইল, সমুদ্রে বিষম তরঙ্গ উঠিল, পৃথিবী টলমল করিল, পর্ব্বত সকল কাঁপিতে লাগিল।

সেই শব্দ মহিষাসুর ও তাহার অনুচর-গণের কানে গেল। তাহারা ত এরূপ শব্দ আর কখনও শুনে নাই! ইন্দ্রের বজ্রধ্বনি তাহারা বহুবার শুনিয়াছে; মহাসমুদ্রের প্রলয়

কল্লোল অনেকবার বিষমগর্জ্জনে তাহাদের গৃহদ্বার আক্রমণ করিয়াছে; পর্ব্বতের বক্ষ-বিদারণ শব্দ কতবার তাহাদের কর্ণপটহে ঘা মারিয়াছে, কিন্তু এরূপ শ্রবণভেদী গম্ভীর হুঙ্কার আর কথনও তাহাদের শ্রুতিমূলে প্রবেশ করে নাই।

মহিষাসুর শব্দ শুনিবামাত্র বিরক্তি সহকারে বলিয়া উঠিল—"আঃ! একি?" তথন অসুর-গণ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া সেই শব্দ লক্ষ্যে ছুটিল। মহিষাসুরও অগণ্য অসুর সৈন্য সঙ্গে লইয়া সেই শব্দ লক্ষ্য করিয়া ধাবিত হইল।

বোধ হয় তাহার আকারটা মহিষের মত ছিল, তাই ঋষি তাহার মহিষাসুর নাম দিয়া-ছেন। তাহার সেনাপতিগণের মূর্ত্তিও তাহার মত বিশ্রী ছিল। তাহাদের নামও তাহাদের আকারের অনুরূপ ছিল। কাহার পায়ে মহিষের মত ক্ষুর, কাহার বিড়ালের মত চোখ,

কাহারও পা দুইটা পিছনে, চোক দুইটা কপালে, কাহারও বা গায়ে ক্ষুরের মত ধারালো লোম,—এইরূপ জন্তুর আকৃতিবিশিষ্ট নানা কুৎসিৎ অসুর জগন্মাতাকে আক্রমণ করিতে চলিল।

এখনই পৃথিবীতে এমন অনেক মানুষ আছে, পশুর সহিত যাহাদের আকারের তুলনা হইতে পারে। কাহারও ঠোঁট পুরু, কাহারও নাক চেপ্টা, কাহারও চুলগুলা ভেড়ার লোমের মত, কাহারও চোখের নীচের হাড় এত উঁচু, দেখিলে ঠিক যেন একটি দ্বিপদ হনুমান বোধ হয়। তা সে কত পূর্ব্বকালের কথা! তখন মানবদেহ সবে মাত্র রচিত হইতেছে। তখন অসুরগুলা যে জন্তুর মত হইবে, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি?

মহিষাসুর যখন সৈন্য লইয়া দেবীকে অবলোকন করিল, তখন তাঁহার শরীর কান্তিতে ত্রিভুবন আলোকিত হইয়াছে, পদভরে

ভূমণ্ডল অবনত হইয়া পড়িয়াছে, কিরীট গগনস্পর্শ করিয়াছে, ধনুষ্টঙ্কার-ধ্বনিতে সমুদায় রসাতল সংক্ষুব্ধ হইয়াছে, এবং ভুজ সহস্রবাহুর আকার ধরিয়া দিঙ্‌মণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিয়াছে।

মায়ের এ বিশ্বরূপ কল্পনাতেও আনিতে আমাদের শক্তি নাই। একবার কুরুক্ষেত্রে মহামতি অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শন করিয়াছিলেন। সেই বিরাট দেহও স্বকীয় কান্তিতে ত্রিভুবন সমুজ্জ্বল করিয়াছিল। কিরীট আকাশে ঠেকিয়াছিল! সেই চির মধুর দ্বিভুজ মুরলীধর সখা অর্জ্জুনের চক্ষে একদিন সহস্রবাহু-প্রসারিত করিয়াছিলেন। দেবতারা যে রূপ দর্শনের জন্য ব্যাকুল, আমরা ক্ষুদ্রজ্ঞানে সেই রূপ কেমন করিয়া অনুমান করিব? কৃষ্ণ-সখা সে রূপের জ্যোতি বহুক্ষণ দর্শন করিতে সমর্থ হন নাই। তাই তিনি সখার পূর্ব্বমূর্ত্তি দর্শনের জন্য ব্যাকুল হইয়া বলিয়াছিলেন—"হে দেবেশ! হে জগতের নিবাসভূমি! তোমার

এই অদৃষ্টপূর্ব্ব রূপ দেখিয়া যদিও আমি হৃষ্ট হইয়াছি, কিন্তু ভয়ে আমার মন বিচলিত হইয়াছে। অতএব হে দেব! তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও; তোমার সেই পূর্ব্বরূপ— সেই নবজলধর শ্যামসুন্দর মূর্ত্তি আমাকে দেখাও।"

এস ভাই! আমরাও সেই প্রকার কর-যোড়ে মাকে বলি—"মা! অসুর নাশিনী! অসুরকুলের সংহার করিয়া তোমার সেই চিরমধুর শ্যামরূপে ধরণীতলকে স্নিগ্ধ করিয়া এক হস্তে বর, অন্য হস্তে অভয় লইয়া তোমার সন্তানগুলির সম্মুখে উপস্থিত হও। আমরা বালকবালিকা প্রাণ ভরিয়া সেই রূপ দেখি, আর উল্লাসে নৃত্য করি।

অসুরগণ দেবীকে দেখিয়াই, চারিদিক হইতে এক সঙ্গে আক্রমণ করিল। কোটি কোটি হাজার রথ, কোটি কোটি হাজার গজ, কোটি কোটি হাজার ঘোড়া একেবারে চারি-

দিক হইতে পিপীলিকার মত মাকে ঘেরিয়া ধরিল। ঘেরিয়া সকলে এক সঙ্গে মায়ের অঙ্গে অস্ত্র সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিল। অসংখ্য অস্ত্র—অসংখ্য নাম! কোন অসুর তোমর দ্বারা, কেহ ভিন্দিপাল দ্বারা, কেহ মুষল দ্বারা, কেহ বা খড়্গ, কেহ বা শল্য, কেহ বা কুড়ালি লইয়া মায়ের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে লাগিল। অসংখ্য অস্ত্র—অসংখ্য নাম। মা একাকিনী—শত্রু অসংখ্য। তথাপি মা শত্রু নিক্ষিপ্ত সেই অসংখ্য অস্ত্রশস্ত্র অনায়াসেই ছেদন করিলেন। অবশেষে তিনি যখন দেখিলেন, প্রবল ঝড়ে সাগরের তরঙ্গের মত অসুরসৈন্য কেবলই বৃদ্ধি পাইতেছে, তখন তিনি এক একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন। এক একটী নিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে হাজার হাজার প্রমথসৈন্য সৃষ্ট হইতে লাগিল। দেবীর নিশ্বাসে জন্মিয়াছে, সুতরাং দেবীর শক্তিও তাহাদের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে।

তাহারা অসুরসৈন্যের যুদ্ধ দেখিয়া স্থির থাকিবে কেন? তাহারা জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই অসুরদিগের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিল। দেবীর বাহন সিংহ—সেই বা এই সকল ব্যাপার দেখিয়া স্থির থাকিবে কেন? মহাশক্তির আধার হিমালয়ের নিকট হইতে সে আসিয়াছে। আসিয়া আদ্যাশক্তিকে বহন করিয়াছে। প্রমথগণ যখন যুদ্ধ আরম্ভ করিল, তখন সে কি কেবল দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া যুদ্ধ দেখিবে? সিংহও ক্রুদ্ধ হইল; তার কাঁধের কেশর কম্পিত হইয়া উঠিল; আর বনের ভিতর দাবানল যেমন লক্‌লক্‌ শিখা লইয়া একস্থান হইতে অন্যস্থানে চলিয়া বেড়ায়, সেও সেইরূপ অসুরসৈন্য মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিল। দেবী কখন ত্রিশূল, কখন গদা, কখন খড়্গ লইয়া অসুরগুলাকে বধ করিতে লাগিলেন। কখন বা শক্তিবৃষ্টি করিয়া কোটি কোটি মহাসুর সংহার করিলেন। দেবীর ঘণ্টার শব্দে

বিমোহিত হইয়া কতকগুলা অসুর মাটীতে আছাড় খাইয়া প্রাণত্যাগ করিল, কতকগুলা নাগপাশে জড়াইয়া ভূমিতে গড়াগড়ি খাইল। কাহার হাত গেল, কাহার পা গেল, কাহারও বা দেহ মধ্যভাগে কাটা পড়িল, আর কত মাথা যে ভূমিতে গড়াগড়ি খাইল, তাহার সংখ্যা রহিল না। সিংহ চারিধারে ছুটাছুটি করিয়া অসুর গুলার মুণ্ড কড়মড় করিয়া চিবাইতে লাগিল।

বহুদিন ধরিয়া দেবী মহিষাসুরের সঙ্গে যুদ্ধ করিলেন; এবং একে একে তাহার সেনাপতিগণকে বধ করিয়া সর্ব্বশেষে তাহাকে নিহত করিলেন।

প্রচণ্ড মহিষাসুরকে নিহত দেখিয়া প্রমথগণ আনন্দে ঢাক ঢোল শঙ্খ ঘণ্টা মৃদঙ্গ বাজাইতে আরম্ভ করিল। জগন্মাতার এই যুদ্ধ মহোৎসবে আনন্দ প্রকাশ করিতে জগতের সমস্ত জীব যোগদান করিল। দেবগণ,

ঋষিগণ দেবীর স্তব আরম্ভ করিলেন, গন্ধর্ব্বগণ গান ধরিলেন, অপ্সরাগণ নৃত্য করিলেন। সেই অম্লানবদনা সর্ব্বশক্তিশালিনী মহিষমর্দ্দিনীর জয়গান বহন করিয়া সমীরণ দিগ্‌দিগন্তে ছুটিয়া গেল।

(৯)

মহিষাসুরের বিনাশে জগতের সমস্ত তাপ দূর হইয়া গেল। ঋষিগণ ভক্তিভরে আগ্যাশক্তির পদপ্রান্তে প্রণত হইয়া বলিতে লাগিলেন—"মা জগদ্ধাত্রি! প্রসন্না হও। তুমি প্রসন্না হইলেই জগতের কল্যাণ হয়। তুমি যাহাদের প্রতি করুণা কর, মানে, ধনে, যশে, তাহারা সকল লোকের পূজা পাইয়া থাকে। তাহাদের সংসারে দুঃখ ক্লেশ থাকেনা। ব্যাধি আসিয়া তাহাদের যাতনা দিতে পারে না। অকালমৃত্যু তাহাদের ঘরে প্রবেশ করিতে পারে না। তাহাদের

সুকৃতির তুলনা নাই। তাহাদের পুত্র কন্যা বিনীত হয়, ভৃত্য প্রভুর বশীভূত হয়; ভার্য্যা পতিপরায়ণা হইয়া থাকে। বিপদে একমনে তোমায় স্মরণ করিলে তুমি প্রাণী সকলের ভয় দূর করিয়া দাও। দারিদ্র্য-দুঃখহারিণী দয়াময়ি! ভয়হারিণী অভয়ে! ভক্তই হউক, অভক্তই হউক, উদাসীনই হউক, শত্রুই হউক, সকলেরই জন্য তোমার চিত্ত করুণায় বিগলিত হইয়া রহিয়াছে। হে বরদে! আমরা তোমার সেই করুণা ভিক্ষা করিতেছি। হে দেবি! তুমি তোমার অস্ত্রদ্বারা আমাদিগকে সকলপ্রকারে রক্ষা কর, সকল দিকে রক্ষা কর। আমাদিগকে রক্ষা কর, জীবকে রক্ষা কর, পৃথিবীকে রক্ষা কর।"

এই বলিয়া ঋষিগণ নন্দনবনের ফুল লইয়া মায়ের পূজা করিলেন, মায়ের অঙ্গ চন্দন কুঙ্কুমে চর্চ্চিত করিলেন। তারপর ভক্তিভরে দিব্য ধূপ দ্বারা জগন্মাতার আরত্তি-করিলেন।

ঋষি ও দেবতার পূজায় প্রসন্না হইয়া জগদ্ধাত্রী সহাস্যবদনে তাঁহাদিগকে বলিলেন—"তোমাদের কি বাঞ্ছিত আছে, তাহা প্রার্থনা কর, আমি আনন্দের সহিত তোমাদিগকে তাহা দান করিতেছি।"

ঋষি ও দেবগণ কহিতে লাগিলেন—"প্রসন্ন-বদনে! তুমি যখন আমাদিগের সম্মুখে, তখন অন্যবর আর কি লইব! আমাদের সমস্ত অভীষ্টই পূর্ণ হইয়াছে, যেহেতু আমাদের শত্রু মহিষাসুর মরিয়াছে। তবে যদি একান্তই আমাদিগকে তোমার বর দিতে হয়, তাহা হইলে এই বর দাও যে, যখনই আমরা তোমাকে স্মরণ করিব, তখনই তুমি আমাদের বিপদ দূর করিয়া দিবে। আর এই বর দাও মা! যে মানব এই সকল স্তবে তোমাকে প্রসন্না করিবে, আমাদের প্রতি প্রসন্না হইয়া তুমি তাহাকে বিভব দিবে, সম্পদ্ দিবে, জ্ঞান দিবে। আর তাহার সংসারটীতে করুণা

ঢালিয়া তাহাকে সকল প্রকারে সুখী করিবে! এই স্থানেই দেব-চরিত্র ও ঋষি-চরিত্রের মর্ম্ম অনুভব কর। নিজেদের জন্য বর লইতে গিয়া তাঁহারা জগজ্জননীর কাছে সমগ্র মানবের কল্যাণ কামনা করিলেন।—

'তাহাই হউক,' বলিয়া মা দেবতাদিগের চক্ষের উপর অদৃশ্য হইয়া গেলেন। মা অদৃশ্য হউন, কিন্তু তিনি দেবতাদের কাছে ধরা দিয়াছেন, প্রতিশ্রুতির বাঁধনে বাঁধা পড়িয়াছেন। যে কেহ ভক্তিভরে আদ্যাশক্তির স্তব করিবে, মাতা তাহার সকল বিপদ দূর করিয়া দিবেন।

(১০)

তৃতীয় বারে মহামায়া আমাদের ঘরের কাছে আসিয়াছেন। এবারেও দুই প্রচণ্ড দানবের হাত হইতে জগৎকে উদ্ধার করিবার জন্য মা আদ্যাশক্তি অবতীর্ণা হইয়াছেন।

এই দুই দানবের নাম শুম্ভ ও নিশুম্ভ। তাহারা দুই ভাই। দুই ভ্রাতারি বিশেষ প্রীতি

ছিল। কনিষ্ঠ নিশুম্ভ সর্ব্বপ্রকারে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শুম্ভের অনুগত ছিল। এই কনিষ্ঠ ভ্রাতারই সাহায্যে সেই প্রচণ্ড দৈত্য শুম্ভ ত্রিলোক জয় করিতে অগ্রসর হইল।

ত্রিলোকের ইন্দ্র অমরাবতীতে রাজত্ব করিতেছিলেন। শুম্ভ নিজের সমস্ত অসুর সৈন্য লইয়া প্রথমেই ইন্দ্রের রাজধানী আক্রমণ করিল। দেবসৈন্য ও অসুরসৈন্যে অনেকদিন ধরিয়া যুদ্ধ হইল। যুদ্ধে দেবতারাই পরাস্ত হইলেন; এবং একে একে সকলে স্বর্গরাজ্য ত্যাগ করিলেন। প্রথমেই ইন্দ্র পলাইলেন। ইন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গে সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, হুতাশন, একে একে সমস্ত দেবতা নিজ নিজ অধিকার ছাড়িয়া পলাইলেন।

শুম্ভ যেমন ইন্দ্রের অধিকার কাড়িয়া লইল, অমনি সঙ্গে সঙ্গে অপরাপর দেবতাদিগের অধিকারও হস্তগত করিল।

তোমরা জিজ্ঞাসা করিতে পার, সূর্য্য,

চন্দ্রকেও যদি নিজ নিজ অধিকার ছাড়িয়া পলাইতে হইল, তবে কি সে সময়ে আকাশে সূর্য্যচন্দ্রের উদয় হইত না? তবে কি সমস্ত পৃথিবী সে সময় দিবারাত্রি অন্ধকারেই ডুবিয়া থাকিত?

ইহার উত্তর দেওয়া আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির সাধ্য নয়। তবে ঋষিরা বলেন, দৈত্যদানবে যে সময় জগৎ অধিকার করে, তখন বাস্তবিকই জগৎ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়। তখন সূর্য্য থাকেন না, চন্দ্র থাকেন না, মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি প্রভৃতি গ্রহরাজগণ সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করেন না। এক অন্ধকার—বিরাট অন্ধকার সমস্ত মেদিনীর উপরে অবাধে রাজত্ব করিতে থাকে। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় দানবের অধিকার ভুক্ত জীব তাহা বুঝিতে সক্ষম হয় না।

দানবেরা অনেক প্রকার মায়া জানে। সেই মায়াবলে তাহারা নানাপ্রকার মূর্ত্তি ধরিয়া জীব সকলকে ভুলাইতে সমর্থ হয়।

যখন চন্দ্র, সূর্য্য, ও গ্রহগণ আপন আপন স্থান ত্যাগ করিলেন, দানবগণও অমনি তাহাদের রূপ ধরিয়া সেই সকল পরিত্যক্ত স্থান গ্রহণ করিল।

আকাশে দানব-সূর্য্য প্রভাতে পূর্ব্বাচলে উদিত হইয়া সন্ধ্যায় পশ্চিমাচলে অস্ত যাইতে লাগিল; দানবী-তারায় অমার গগন আচ্ছন্ন হইল; পূর্ণিমার রজনী দানব-চন্দ্র মাথায় ধরিয়া দানবী-কৌমুদীর বসন পরিল।

দানবী-মায়া-মুগ্ধ মানব দেখিল, সূর্য্য উঠিয়াছে, চন্দ্র উঠিয়াছে, তারায় তারায় আকাশ ভরিয়া রহিয়াছে। কিন্তু দেবতা ও ঋষি জানিলেন, সমস্ত জগতে অন্ধকার— কি বিরাট বিশ্বগ্রাসী ধর্ম্মবিনাশী অন্ধকার!

দেবতারা দৈত্যভয়ে মানুষের রূপ ধরিয়া পৃথিবীতে লুকাইয়া রহিলেন। শুম্ভ ত্রিলোকে একাধিপত্য করিতে লাগিল।

পরাজিত, রাজ্যভ্রষ্ট, অধিকার চ্যুত, স্বর্গ

হইতে তাড়িত, ভয়কম্পিত দেবগণ মুক্তির অন্য উপায় না দেখিয়া জগন্মাতাকে স্মরণ করিলেন।

"বিপদ উপস্থিত হইলে যদি আমাকে তোমরা যথাবিধি স্মরণ কর, তাহা হইলে আমি তোমাদের সকল বিপদ দূর করিয়া দিব।" মহামায়া দেবগণকে পূর্ব্বে এই বর দিয়াছিলেন। সেই বরের কথা দেবতাদের মনে হইল। মনে হইবামাত্র তাঁহারা হিমালয়ে গমন করিলেন; এবং সকলে সমবেত হইয়া মহামায়ার স্তব আরম্ভ করিলেন।

নমি দেবী মহাদেবী শিবানী প্রকৃতি।
ভদ্রা রৌদ্রা গৌরী ধাত্রী করি মা প্রণতি॥
নমি দুর্গা নমি কৃষ্ণা হে সর্ব্বকারিণী।
নমি মা কল্যাণরূপা নমি মা শর্ব্বাণী॥

সর্ব্বভূতে বিষ্ণুমায়া যে দেবী শব্দিতা,
চেতনা সকল ভূতে যিনি অভিহিতা,

বুদ্ধিরূপে যেই দেবী জীবের ভিতরে,
নমস্কার নমস্কার নমস্কার তাঁরে ॥

নিদ্রা ক্ষুধা ক্ষান্তি তৃষ্ণা শান্তি জাতি মায়া
শ্রদ্ধা লজ্জা তুষ্টি কান্তি বৃত্তি স্মৃতি ছায়া
জীবমধ্যে যিনি আর দয়ারূপ ধ'রে,
নমস্কার নমস্কার নমস্কার তাঁরে ॥

লক্ষ্মীরূপে মাতৃরূপে ব্যাপ্তিরূপে আর
শক্তিরূপে জীব মধ্যে অবস্থিতি যাঁর
সংজ্ঞারূপে আবরিয়া নিখিল সংসারে
নমস্কার নমস্কার নমস্কার তাঁরে ॥

জগজ্জননীর স্তবে দেবতারা তন্ময় হইয়া গেলেন। ভক্তি-বিনম্র দেবতার কণ্ঠোচ্চারিত স্তুতি-গীতি করুণাময়ীর হৃদয়কে ব্যাকুল করিয়া তুলিল। তিনি আর ভক্তের চক্ষে লুকাইয়া থাকিতে পারিলেন না। জাহ্নবীতে স্নান করিবার ছল করিয়া তিনি দেবগণের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন ;—

"আপনারা এখানে কাহাকে স্তব করিতেছেন?"

ঋষি এইখানে একটী অলৌকিক বিস্ময়কর ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। সামান্যা রমণীজ্ঞানে দেবগণ বোধ হয়, পার্ব্বতীর প্রশ্নের উত্তর দানে ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। কিন্তু দেবীর প্রশ্ন ত নিরর্থক নয়! দুর্গা জগতের দুর্গতি নাশে অভিলাষিণী হইয়া প্রশ্ন করিয়াছেন, দুর্গতিগ্রস্ত হতবুদ্ধি দেবগণ সে প্রশ্নের উত্তর দিতে সমর্থ হইলেন না। তাই বলিয়া কি ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা ব্যাহতা হইবে? দেখিতে দেখিতে পার্ব্বতীর শরীর-কোষ হইতে তাঁহারই অনুরূপ অন্য এক পরম রমণীয় মূর্ত্তি বাহির হইয়া উত্তর করিলেন—"সমরে নিশুম্ভ কর্ত্তৃক পারাজিত হইয়া ও শুম্ভ কর্ত্তৃক নিজ নিজ অধিকার হইতে তাড়িত হইয়া এই সকল দেবতা আমারই স্তব করিতেছেন।"

চক্ষের নিমেষে যেন কোথা হইতে কি

হইয়া গেল! আকুলনেত্রে দেবগণ চাহিতে দেখিলেন, হিমালয়-শিরে সুধাতরঙ্গিনী জাহ্নবী-তীরে পর্ব্বতনন্দিনী গৌরী সহসা শ্যামরূপে ভুবন উজ্জ্বল করিয়া একহস্তে বর অন্যহস্তে অভয় লইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। অমনি দেবগণের মস্তক ভক্তিভরে শ্যামার চরণপ্রান্তে অবনত হইল। ভগবতীর আশ্বাসবাণীতে প্রীত হইয়া তাঁহারা সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

পার্ব্বতী কালিকানামে প্রসিদ্ধা হইয়া হিমাচলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এইজন্যই পূর্ব্বে বলিয়াছি, আদ্যাশক্তি ক্রমে আমাদের ঘরের কাছে আসিয়াছেন। জীবের ভয় ঘুচাইতে ভগবতী এবারে গিরিরাজের গৃহে অবতীর্ণা!

পর্ব্বতনন্দিনীর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে গিরিরাজের শূন্য ভবন পূর্ণ হইয়া গেল। তাহার চিরতুষারাবৃত শৃঙ্গসকল বিবিধ রত্নধাতুরাগে

রঞ্জিত হইয়া দিঙ্মণ্ডল বিভাসিত করিয়া তুলিল। অন্যান্য শৃঙ্গসকল অসংখ্য বৃক্ষলতা ও গুল্মে সমাচ্ছন্ন হইল ; এবং পর্ব্বত বাহিনী নির্ঝরিণীর মধুর শব্দে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল।

(১১)

শুম্ভ-নিশুম্ভের দুইজন ভৃত্য চণ্ড ও মুণ্ড ভ্রমণ করিতে করিতে হিমালয়ের পাদদেশে আসিয়া উপস্থিত হইল। উপস্থিত হইয়া তাহারা দেখিল, কোথা হইতে এক অভিনব সলিলতরঙ্গ পর্ব্বতের মূলপ্রান্ত সিক্ত করিতেছে। সেই শুভ্র সলিলা তটিনীতীরে এক অপূর্ব্ব কাঞ্চন-কমল প্রস্ফুটিত হইয়াছে। সেই কাঞ্চন-কমলের সৌরভে সেই পার্ব্বত্য দেশের সমীরণ সুবাসিত হইয়াছে।

হিমালয়ের এই সহসা রূপপরিবর্ত্তনের কারণ নির্ণয়ে অসমর্থ হইয়া তাহারা দুই ভাই প্রথমে বড়ই বিস্মিত হইল। কতদিন ত তাহারা হিমালয়ের নিকট দিয়া যাতায়াত করি-

য়াছে, কিন্তু কই নীরস হিমালয়ে এরূপ রস-প্রবাহ আর কখন ত তাহারা দেখে নাই! শুম্ভের কৃপায় তাহারা ত্রিভুবনের সকল সুন্দর স্থান দেখিয়াছে, নন্দনে কাননে পরিভ্রমণ করিয়াছে। কিন্তু হিমগিরির আজ যেরূপ শোভা, নন্দনেও ত কখন তাহারা সেরূপ শোভা দেখে নাই! মুগ্ধ হইয়া দুই ভাই পর্ব্বতের শোভা দেখিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে তাহারা দেখিল, এক অপূর্ব্ব সুন্দরী কুমারী অপরূপ শ্যামাঙ্গের শোভায় ভুবন আলোকিত করিয়া পর্ব্বতের অধিত্যকাদেশে বিচরণ করিতেছেন।

সেই কুমারীকে দেখিবামাত্র তাহারা কালবিলম্ব না করিয়া তাহাদের রাজাকে সংবাদ দিল। বলিল—"মহারাজ! অতি মনোহরা একটি রমণী স্বকীয় শ্যামশোভায় সুশুভ্র হিমাচল সমুজ্জ্বল করিয়া রহিয়াছে। তাদৃশ পরম মনোহররূপ ত্রিভুবনে কেহ কোথাও দেখে নাই। ইনি কোন্ দেবী প্রথমে আপনি অবগত হউন;

তাহার পর ইহাকে গ্রহণ করুন! একবার দেখিয়া আসুন, তাঁহার রূপপ্রভায় দশদিক প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে।”

চণ্ড ও মুণ্ড বলিতে লাগিল—“ত্রিভুবনে যেখানে যাহা কিছু উৎকৃষ্ট ছিল, সমস্তই আপনি অধিকার করিয়াছেন। ইন্দ্রের নিকট হইতে আপনি করিরাজ ঐরাবত এবং ঘোটক-শ্রেষ্ঠ উচ্চৈঃশ্রবা লাভ করিয়াছেন। নন্দনের পারিজাত আপনার অট্টালিকার প্রবেশ পথে কল্প-কুসুম মাথায় লইয়া ছায়াদান করিতেছে। ধনেশ্বর কুবেরের নিকট হইতে আনীত. মহাপদ্ম নামে নিধিরত্ন, সমুদ্রদত্ত উৎকৃষ্ট কেশর বিশিষ্ট অম্লান পদ্মমালা, বরুণ-দত্ত কাঞ্চনস্রাবী ছত্র—অপূর্ব্ব ভূষণ, অপূর্ব্ব বসন—সমস্তই আপনার গৃহে শোভা পাইতেছে। এমন কি হংস সংযুক্ত, রত্নরূপে পরিণত, যে অদ্ভুত রথ পূর্ব্বে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার ছিল, সেই বিমান-রত্ন এক্ষণে আপনার গৃহ-প্রাঙ্গণ আশ্রয় করিয়াছে।

হে দৈত্যরাজ! ভুবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রত্ন সমুদায় যখন আপনি অধিকার করিয়াছেন, তখন কি জন্য এই কল্যাণী রমণীরত্ন গ্রহণ করিতেছেন না?"

(১২)

চণ্ডমুণ্ডের কথা শুনিয়া বিস্মিত দৈত্যরাজ সুগ্রীব নামক অনুচরকে আহ্বান করিলেন। সুগ্রীব নিকটে আসিলে, তিনি তাহাকে বলিলেন—"তুমি এই দণ্ডেই হিমালয় প্রদেশে গমন কর। এবং পর্ব্বতের অধিত্যকায় বিচরণশীলা দেবীর নিকটে উপস্থিত হইয়া আমার ঐশ্বর্য্যের কথা জ্ঞাপন কর, এবং যাহাতে প্রীত মনে তিনি এখানে আগমন করেন, তাহার ব্যবস্থা কর।"

দৈত্যরাজ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া সুগ্রীব হিমালয়ে গমন করিল। যাইয়া দেখিল, রক্তবস্ত্র পরিধানা প্রকৃতিভূষণা শ্যামা এক পরম রমণীয় অধিত্যকায় দাঁড়াইয়া আছেন। পার্শ্বে সহস্র কাঞ্চন-দলে কমল ফুটিয়াছে; সম্মুখে

জাহ্নবীতরঙ্গদত্ত অসংখ্য রত্নোপহার পতিত রহিয়াছে; পদতলে কুণ্ডলিত সিংহ সেই কোমল চরণের ভার ধরিবার জন্য যেন সর্ব্বশক্তি পুঞ্জীকৃত করিয়াছে।

জননী একহস্তে ভূমি সংলগ্ন ত্রিশূল ধরিয়া অন্য কর-কমল ঈষদুত্তোলিত করিয়া জগতে অভয় বিতরণ করিতেছিলেন। শ্রীচরণচুম্বিত কেশরাশি মলয় পবনে আন্দোলিত হইয়া গিরি-শিখরে মেঘের তরঙ্গ তুলিতেছিল। নীল নলিনাভ নয়ন উর্দ্ধে জ্যোতিধারায় সমস্ত আকাশকে নীলবর্ণে রঞ্জিত করিতেছিল। ধ্যানস্থা যোগিনীর ন্যায় জগদ্ধাত্রী মানবীদেহে আপনার ভুবনব্যাপিনী মাধুরী উপভোগ করিতেছিলেন।

সুগ্রীব ধীরে ধীরে পার্ব্বতীর সমীপে উপস্থিত হইল। এবং অতি কোমলভাবে মধুর বাক্যে তাঁহাকে বলিতে লাগিল—"হে দেবি! দৈত্যরাজ শুম্ভ ত্রিভুবনের একাধিপতি; আমি

তাঁহার প্রেরিত দূত; এখানে আপনার নিকটে আগমন করিয়াছি।"

পার্ব্বতী বলিলেন—"কি জন্য আসিয়াছ বল।"

সুগ্রীব বলিল—"সেই দৈত্যরাজের কথা আপনাকে শুনাইতে আসিয়াছি। তিনি বলেন, 'এই নিখিল ত্রৈলোক্য আমারই। দেবগণ আমার আজ্ঞানুবর্ত্তী। এই নিখিল ভূমণ্ডলে যেখানে যা সর্ব্বোৎকৃষ্ট রত্ন ছিল, সমস্তই আমার করতলগত হইয়াছে। দেবগণ, গন্ধর্ব্বগণ, নাগগণ সকলে আমাকে প্রণাম করিয়া, সেই সকল রত্ন আমাকে উপহার দিয়াছেন। আপনিও স্ত্রীরত্ন, সুতরাং আমার অধিকারে আসিবার যোগ্য। আমার পত্নী হইলে আপনি অতুল পরমৈশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইবেন; বুদ্ধিদ্বারা ইহা সমালোচনা করিয়া আপনি আমার অথবা আমার মহাবিক্রমশালী ভ্রাতা নিশুম্ভের পত্নীত্ব স্বীকার করুন'।" প্রভুর উক্তি দেবীকে শুনা-

ইয়া সুগ্রীব দেবীর উত্তরের প্রতীক্ষায় নীরব হইল।

দেবী কহিলেন—"তুমি সত্য বলিয়াছ। শুম্ভ সম্বন্ধে তুমি কিছুই মিথ্যা বল নাই। শুম্ভ ত্রিলোকের অধীশ্বর; নিশুম্ভও তাঁহারই তুল্য। কিন্তু এই বিবাহ বিষয়ে আমি একটী প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। আমি কেমন করিয়া তাহা মিথ্যা করি?"

সুগ্রীব জিজ্ঞাসা করিল—"কি প্রতিজ্ঞা বলুন।"

পার্ব্বতী কহিলেন—"অল্পবুদ্ধিবশতঃ পূর্ব্বে আমি যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি তাহা শ্রবণ কর। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি—

যো মাং জয়তি সংগ্রামে যো মে দর্পং
ব্যপোহতি।
যো মে প্রতিবলো লোকে স মে ভর্ত্তা
ভবিষ্যতি॥

যে ব্যক্তি আমাকে সংগ্রামে পরাজিত করিবে, যে ব্যক্তি আমার দর্প চূর্ণ করিবে, যে ব্যক্তি আমার তুল্য শক্তিশালী, তাহাকেই আমি স্বামিত্বে বরণ করিব। অতএব অসুর-রাজ শুম্ভ, অথবা তাঁহার ভ্রাতা নিশুম্ভ এখানে আসুন। বিলম্বে প্রয়োজন নাই। শীঘ্র আমাকে পরাজিত করিয়া আমার পাণিগ্রহণ করুন।”

এতক্ষণ দৈত্যদূত মিষ্টবাক্যে দেবীর সহিত কথা কহিতেছিল। দেবীর এই বিস্ময়কর বাক্য শুনিয়া, অবলার এই অসম্ভব অহঙ্কার দেখিয়া, তাহার মনে ক্রোধের সঞ্চার হইল। সে ত্রিলোকাধিপতির অনুচর, নিজেই দেব-পরাভবের বল ধারণ করে, সে একজন কোমলা কুমারীর গর্ব্ব সহ্য করিতে পারিবে কেন? ক্রোধে সুগ্রীব বলিয়া উঠিল—“হে দেবি! আমি দেখিতেছি, রূপের অহঙ্কারে তোমার মতিবুদ্ধি বিকৃত হইয়াছে। সাবধান!

আমার সম্মুখে এরূপ কথা আর বলিও না। ত্রিভুবনে এমন পুরুষ কে আছে যে শুম্ভ-নিশুম্ভের সম্মুখে যুদ্ধার্থী হইয়া দাঁড়াইতে পারে? ইন্দ্র তাহার বজ্র হইয়া, বরুণ তাহার পাশ লইয়া, কুবের তাহার শক্তি লইয়া, যম তাহার দণ্ড লইয়া শুম্ভের বলের সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারে নাই। শুম্ভনিশুম্ভের কথা দূরে থাকুক, সমস্ত দেবগণ মিলিত হইয়াও আমাদের ন্যায় দৈত্যগণের সম্মুখেও দাঁড়াইতে পারে না। তুমি রমণী, তাহাতে একাকিনী; যুদ্ধার্থিনী হইয়া তুমি কিরূপে শুম্ভনিশুম্ভের সম্মুখে দাঁড়াইবে! আমিই তোমাকে উপদেশ দিতেছি। তোমার প্রতিজ্ঞার কথা রাখ। এখনি শুম্ভনিশুম্ভের নিকট গমন কর। কেশাকর্ষণে হতগৌরবা হইয়া যাইও না।"

পার্ব্বতী দূতের কথায় ঈষৎ হাসিয়া উত্তর করিলেন—"তুমি যাহা বলিলে তাহা ত বটেই। শুম্ভনিশুম্ভ যে বলী ও বীর্য্যশালী তাহাতে

সন্দেহ কি ? কিন্তু কি করি বল, পূর্ব্বে বিবেচনা না করিয়া আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি।"

সুগ্রীব বুঝিল, বিনা বলপ্রয়োগে এ রমণী শুম্ভভবনে যাইবে না। বলিল—"তবে আমি দৈত্যরাজকে এই কথা বলি ?"

দেবী বলিলেন—"হাঁ! তুমি আমার দূত হইয়া সেখানে যাও; আমি যাহা যাহা বলিলাম, সে সমস্ত দৈত্যরাজকে বল। তিনি শুনিয়া যাহা যুক্তিযুক্ত করিবেন।"

দেবীর উত্তর শুনিয়া সুগ্রীব বড়ই ক্রুদ্ধ হইয়াছিল। ক্রুদ্ধ হইবারই কথা। সে নিজেই একটা পৃথিবীজয়ী বীর, তাহার সম্মুখে একটা ক্ষুদ্র কুমারী বলের গর্ব্ব করিতেছে, বীরশ্রেষ্ঠ শুম্ভকে যুদ্ধে নিমন্ত্রণ করিতেছে, ইহা কোন্ বীর সহ্য করিতে পারে ? একবার সে মনে করিল, আমিই এই বালিকাটার কেশাকর্ষণ করিয়া দৈত্যরাজের কাছে ধরিয়া লইয়া যাই। কিন্তু তাহা ত হইতে পারে না! সে কেবল-

মাত্র দূত হইয়া আসিয়াছে, তাহার যুদ্ধ করা নীতিশাস্ত্রের বিরুদ্ধ। এইজন্য সে মনের রাগ মনেই চাপিয়া তাহার রাজার নিকটে গমন করিল, এবং শুম্ভ যেখানে দানবগণকে লইয়া সভা করিয়া বসিয়াছিলেন, সেইখানে উপস্থিত হইল।

(১৩)

শুম্ভ সুগ্রীবকে দেখিয়াই রমণীর বৃত্তান্ত জানিতে চাহিলেন, এবং তাহার সঙ্গেই সে আসিল না কেন, তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

সুগ্রীব করযোড়ে উত্তর করিল,—"মহারাজ! সে রমণী হয় উন্মাদিনী, না হয় গর্ব্বিনী। আমি তাহার নিকটে যাইয়া আপনার আদেশ জানাইলাম। শুনিয়া রমণী অবজ্ঞার সহিত বলিল,—'যে আমাকে যুদ্ধে পরাজিত করিতে পারিবে, সেই আমার স্বামী হইবে।' এই বলিয়া সে আপনাকে অথবা আপনার ভ্রাতাকে সমরে আহ্বান করিয়াছে। বলিয়াছে, "শুম্ভ কিম্বা নিশুম্ভ এখানে আসুন ;

এবং শীঘ্র আমাকে পরাজিত করিয়া আমার পাণি-গ্রহণ করুন।”

সুগ্রীবের মুখে অপরিচিতার কথা শুনিয়া, সভাস্থ দৈত্যের দল হাস্য করিয়া উঠিল। তাহারা হাসিল, যেন তাহারা সুগ্রীবের কথায় বিশ্বাস করিতে পারিল না। কিন্তু শুম্ভ হাসিলেন না। যে ব্যক্তি স্বকীয় ক্ষমতা ও বীর্য্যবলে ত্রিলোক অধিকার করিতে সমর্থ, দেবতারা যাহার ভয়ে আত্মগোপন করে, সে ব্যক্তি বুদ্ধিতেও যে অসাধারণ তাহাতে সন্দেহ কি? তাহার ভিতরে দেবতাদিগেরও অধিক শক্তি বিদ্যমান। তবে দেবতা ও দানবে প্রভেদ এই, দেবতারা সত্ত্বগুণ প্রধান, আর দানবদিগের ভিতরে রজঃ ও তমোগুণের আধিক্য।

এই তিন গুণের বিষয় সম্যক্‌রূপে বুঝা তোমাদিগের পক্ষে আপাততঃ কঠিন হইবে। তথাপি আমি এই গুণের কথা

উল্লেখ করিলাম। এই সময় হইতেই তোমাদের এই ত্রিগুণ সম্বন্ধে অন্ততঃ সামান্য কিছু জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

তোমরা হয়ত দেখিয়াছ যে, তোমাদের বালকবালিকাদিগের মধ্যে চরিত্রগত কত প্রভেদ! যদি না দেখিয়া থাক, তাহা হইলে এইবার হইতে দেখিও; এবং সেই সঙ্গে আপনার দিকেও দৃষ্টি করিও। তাহা হইলে এই তিনটী গুণসম্বন্ধে অনেকটা উপলব্ধি করিতে পারিবে।

তোমাদিগের মধ্যে দেখিবে কেহ সদানন্দময়, কেহ অভিমানী, কেহ ক্রোধী, কেহ শান্ত, কেহ চঞ্চল; কেহ কর্ম্মকুশল,—সর্ব্বদাই কাজ করিতে ভাল বাসে; কেহ অলস—কাজ করিতে চাহে না,—কাজের কথা শুনিলেই তাহার জ্বর আসে; কেহ পরকে দান করিয়া আনন্দলাভ করে, কেহ পরের নিকট হইতে লইতে পারিলেই সন্তুষ্ট হয়; কেহ পিতা মাতা

প্রভৃতি গুরুজনকে ভক্তি করে, আবার কেহবা তাঁহাদের সর্ব্বদাই বিরক্ত করিয়া থাকে। একটু স্থিরতার সহিত দেখিলেই তোমরা তোমাদের মধ্যে এই চরিত্রগত পার্থক্য বুঝিতে পারিবে। কেন এই পার্থক্য হয়, পরে বলিতেছি। আগে এই গুণের মহিমা শুন।

ঋষি বলেন—এই তিনটী গুণ লইয়াই জগতের অস্তিত্ব। যেদিন জগৎ হইতে এই তিনটী গুণ তিরোহিত হইবে, সেই দিনই জগতের ধ্বংস হইবে। তখন বৃক্ষ, লতা, পশু, পক্ষী, মানব, নদী, পর্ব্বত, এই পৃথিবী, আকাশে চন্দ্র, সূর্য্য, তারা, নক্ষত্র ও দেবতা কিছুই থাকিবে না।

আদ্যাশক্তি মহামায়া এই তিনটী গুণ লইয়াই তাঁহার এই বিশাল সংসার রচনা করিয়াছেন। তোমরা ত পূর্ব্বেই দেখিয়াছ, নারায়ণ অনন্ত শয্যায় যোগনিদ্রায় মগ্ন হইয়া শয়ন করিয়াছিলেন। ব্রহ্মার কাতর আহ্বা-

নেও তিনি জাগরিত হইলেন না। শেষে ব্রহ্মা স্তবে মহামায়ার আবাহন করিলেন। আদ্যাশক্তি মহামায়ার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে নারায়ণের নিদ্রাভঙ্গ হইল। অমনি মধু-কৈটভের নিধনে ভুবন সৃষ্ট হইল।

যিনি পরমেশ্বর তাঁহাকে ঋষিরা নির্গুণ বলিয়াছেন। কিন্তু মহামায়া গুণময়ী। তাঁহারই সাহায্যে ভগবান সংসারের সৃষ্টি করিয়াছেন। এই জন্যই মহামায়ার নাম আদ্যাশক্তি—আদি-জননী।

সুতরাং সংসারের সমস্ত সৃষ্ট পদার্থেই সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ,—এই তিনটী গুণ আছে। এই ত্রিগুণ স্থলে আছে, জলে আছে, বায়ুতে আছে; পশুপক্ষী জীবে আছে, মানুষে আছে; দৈত্যে আছে, দেবতায় আছে; ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবে আছে। উচ্চদেবতা হইতে আরম্ভ করিয়া মৃত্তিকার একটী পরমাণু পর্য্যন্ত কেহই এই ত্রিগুণের খেলা হইতে নিস্তার পায় নাই।

তবে এই তিনটী গুণ সকল বস্তুতে সমান নয়। কাহাতে সত্বগুণ অধিক, কাহাতে বা রজোগুণের আধিক্য, কাহাতে বা তমোগুণের প্রাধান্য।

নির্ম্মলতা সত্বগুণের চিহ্ন; রজোগুণের চিহ্ন চঞ্চলতা; তমোগুণের অলসতা। এই তিন গুণের এই তিনটী প্রধান চিহ্ন। এই সকল চিহ্নের আবার নানারূপ। সে সমস্ত সবিস্তারে উল্লেখ করা এ ক্ষুদ্র পুস্তকের উদ্দেশ্য নয়। এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে, এ জগতে যাহা কিছু নির্ম্মল ও মধুরতাময়, তাহাই সত্ব-গুণপ্রধান; যাহা চঞ্চল ও ক্রিয়াশীল, তাহাতেই রজোগুণের আধিক্য, এবং যাহা গতিহীন ও ক্রিয়াহীন, তাহাতে তমোগুণ অধিক পরিমাণে অবস্থান করিতেছে।

সত্বগুণ হইতে শান্তি, সুখ ও মধুরতা উৎপন্ন হয়; কামক্রোধাদি রিপু এবং সেই জন্য চিত্তের অস্থিরতা ও শোকদুঃখাদি রজো-

গুণ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে; মোহ ও মত্ততা তমোগুণের ফল।

দেবতায় সত্বগুণের প্রাধান্য, এই জন্য তাহারা শান্তিময় ও সুখী। দানবে রজঃ ও তমোগুণের প্রাধান্য, এই জন্য তাহারা ক্রোধী, লোভী ও চিরলালসাময়—জগতের আধিপত্য লাভ করিলেও তাহাদের লালসা মিটে না, সুতরাং দুঃখ ঘুচে না।

এইবারে মানুষ লইয়া কথা। আমি তোমাদিগকে পূর্ব্বে পরস্পরের চরিত্রগত পার্থক্য লক্ষ্য করিতে বলিয়াছি। আবার সেই সঙ্গে নিজের নিজের চরিত্রের প্রতিও দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে বলিয়াছি। কেন বলিয়াছি, এইবারে কতক বুঝিতে পারিয়াছ। সত্ব, রজঃ, তমঃ—ত্রিগুণের যে কি গুণ তাহা বোধ হয় অনুভব করিয়াছ।

তোমাদিগের মধ্যে যে বালকবালিকা সদানন্দময়, শান্ত, পরোপকারী, সত্যবাদী,

গুরুজন ও দেবতায় ভক্তিযুক্ত এবং যে কুটিলতা, ক্রোধ ও লোভ শূন্য, সে সত্ব প্রধান। জানিও, দেবতার গুণ তাহাতে বর্ত্তমান রহিয়াছে। যে ক্রোধী, লোভী, অভিমানী, চঞ্চল, যে দাম্ভিক, দৃপ্ত, পরুষ প্রকৃতিক তাহাতে অধিক পরিমাণে রজোগুণ আছে। যে অলস, অকর্ম্মণ্য, কাজের নামে যাহার জ্বর আসে, বসিয়া বসিয়া খাইতে ভালবাসে, দিবারাত্রি ঘুমাইতে চায়, অথবা বসিয়া বসিয়া পরনিন্দায় কালকাটায়, তাহাতে তমোগুণ অধিক পরিমাণে অবস্থান করিতেছে। জানিও, ইহারা অসুরের স্বভাব প্রাপ্ত হইয়াছে।

এইবারে সকলে নিজে নিজের চরিত্রের প্রতি লক্ষ্য করিবে। লক্ষ্য করিয়া বুঝিবে তুমি কোন্ স্বভাবসম্পন্ন—দেব কিম্বা দানবীয়।

পূর্ব্বোক্ত গুণগুলিকে ভগবান গীতায় সম্পত্তি বলিয়াছেন। ধনমানাদি ঐশ্বর্য্যকে

তিনি সম্পত্তি বলেন নাই। যদি তোমরা দৈব সম্পদের অধিকারী হও, তাহা হইলে তোমরা ক্ষুদ্র মানবাকারে দেবতা। আর যদি তোমরা আসুরী সম্পদের অধিকারী হও, তাহা হইলে —দুঃখ করিও না—তোমরা সুন্দর মানব দেহে দানবের হৃদয় লাভ করিয়াছ।

ইহাতে হতাশ হইবার প্রয়োজন নাই। প্রত্যেক মানবের ভিতরে এই দুই ভাব আছে। পূর্ণদেবতা ও পূর্ণদানব মানবের ভিতরে নাই। আর যদিই থাকে, তা আমাদের সাধারণ মানবের অজ্ঞেয়।

যে দেব-ভাবাপন্ন তাহার ভিতরেও আসুরিক গুণ অনেক বিদ্যমান আছে। যে অসুর-ভাবাপন্ন সে ব্যক্তিও অনেক দৈবী সম্পদের অধিকারী। দিবারাত্রি আমাদের ভিতরে এইরূপ দেব-দানবের যুদ্ধ চলিতেছে। আমরা সকলেই অসুরভাব দূর করিয়া অন্তরে দৈব-ভাব প্রতিষ্ঠা করিতে অল্প বিস্তর চেষ্টা করি-

তেছি। তোমরাও চেষ্টা কর। যখন অশক্ত বোধ করিবে, তখন মহামায়ার শরণাপন্ন হইবে। তিনি তাঁহার শক্তি দিয়া অসুরগুলাকে দূর করিয়া দিবেন। তখন তোমরা মাতৃভূমির বক্ষে নৃত্যশীল এক একটী দেবশক্তি নিজ নিজ রূপ প্রভায় জন্মভূমির মহিমা বিস্তার করিতে সমর্থ হইবে।

দৈত্যরাজ শুম্ভ জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রত্নাদির অধিকারী হইয়াছিলেন। লোক-চক্ষে তাঁহার পাইবার আর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। তথাপি তাঁহার বাসনার বিলয় হয় নাই। আরও কোথা হইতে কি যেন পাইবার জন্য, পূর্ণ ঐশ্বর্য্যের মধ্যে, জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসনে বসিয়াও তিনি আকাঙ্ক্ষার ভারে অবসন্ন হইতে ছিলেন। এমন সময়ে চণ্ডমুণ্ড আসিয়া তাঁহাকে রমণী-রত্নের সংবাদ প্রদান করিল। অতৃপ্তলালসা রমণীরত্নের নাম শুনিবামাত্র প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। যদি কামনারই

নিবৃত্তি না হইল, তখন অনন্ত ঐশ্বর্য্যেই বা সুখ কোথায় ?

লালসাপূর্ণ হৃদয়ে অসুখী দৈত্যেশ্বর প্রতি-মুহূর্ত্তেই সে বরবর্ণিনীর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, সুন্দরী তাঁহার আদেশ বহুসম্মানে শিরে ধরিয়া তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিতে আসিবে।

(১৪)

শুম্ভ সিংহাসনে বসিয়াই সুন্দরীর আগমনের অপেক্ষা করিতেছিলেন, এমন সময়ে সুগ্রীব আসিয়া অশুভ সংবাদ প্রদান করিল। পার্ব্বতীর গর্ব্বকথা শুনিয়া সভাশুদ্ধ লোক হাসিল ; কিন্তু শুম্ভ হাসিলেন না।

তাহার প্রচণ্ড দম্ভে আজ প্রথম আঘাত লাগিয়াছে। শুধু তাই নয়, ত্রিলোকের জীব —দেবদানব যক্ষ গন্ধর্ব্ব—যাঁহার তেজের সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারে নাই, সেই দুর্জ্জয়

শক্তিকে ব্যাহত করিবার জন্য এক রমণী দণ্ডায়মান হইয়াছে।

তাহাকে অবলা জ্ঞান করিতে দৈত্যরাজের সাহস হইল না। সুগ্রীবের কথা শুনিবামাত্র শুম্ভ বুঝিয়া ছিলেন, অবলার কমনীয় কলেবরে ত্রিভুবন-নাশিনী শক্তি লুকাইয়া, সেই রমণী তাঁহাকে ও তাঁহার ভ্রাতা নিশুম্ভকে সমরে আহ্বান করিয়াছে। সুগ্রীবাদি ক্ষুদ্রবুদ্ধি দানব কেশাকর্ষণে রমণীকে ধরিয়া আনিবার স্পর্দ্ধা করিতে পারে, কিন্তু শুম্ভ তাহা পারিলেন না। অথচ সমরের আহ্বান পাইয়া বসিয়া থাকা তাহার ন্যায় বীরের অসম্ভব।

রমণীর বাক্য শুনিয়া, অদম্য লালসার পথে প্রতিহত হইয়া, যদিও ক্রোধে তাঁহার সর্ব্বশরীর কম্পিত হইতেছিল, তথাপি তিনি একান্ত বুদ্ধিহীনের কার্য্য করিলেন না। সভাস্থ যে কোন একজন বীরকে দিয়া রমণীকে বন্দিনী করিতে আদেশ দিলেন না।

সভাস্থ অসুরগণের মধ্যে প্রত্যেকেই সেই উদ্ধতা রমণীকে ধরিয়া আনিবার জন্য দৈত্য-রাজের আদেশের অপেক্ষা করিতেছিল।

শুম্ভ তাহাদিগকে নিরাশ করিয়া, পার্শ্ববর্ত্তী দানব সেনানী ধূম্রলোচনকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"ধূম্রলোচন! তুমি নিজের সৈন্য পরিবারিত হইয়া, হিমালয়ে যাও; এবং সেই দুষ্টার কেশাকর্ষণে তাহাকে বিবশা করিয়া আমার নিকটে আনয়ন কর।

সভাশুদ্ধ দানব রাজার কথায় বিস্ময়ান্বিত হইল। একজন অবলাকে বন্দিনী করিতে এত আয়োজন!

কিন্তু রাজার কথায় কে প্রতিবাদ করিতে সাহস করিবে? ধূম্রলোচন সৈন্য লইয়া পার্ব্বতীকে বন্দিনী করিতে চলিল।

এখন হইতে আমরা মাকে দুর্গা নামে অভিহিত করিব। শুম্ভ নিজেই তাঁহাকে ঐ নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। শুম্ভনিশুম্ভের

সঙ্গে জগন্মাতা চণ্ডিকার যে ত্রিভুবনের ভয়াবহ সংগ্রাম হইয়াছিল, তাহাতে তাঁহাকে প্রয়োজন বশে অনেক রূপ ধরিতে হইয়াছিল। দানবসকল মায়াবী। তাহারা যখন যেমন মায়া আশ্রয় করিয়া যুদ্ধার্থে মহামায়ার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিল, মহামায়াও তখনই সেই প্রকার মায়ার প্রতিরূপে আপনার প্রাণ আচ্ছাদিত করিয়া তাহাদের সংহার করিয়াছিলেন। সেই সকল স্বকীয় অনন্তশক্তি হইতে উৎপন্ন ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যকরী শক্তিকে তিনি নিজেই ভিন্ন ভিন্ন নাম প্রদান করিয়াছিলেন।

তথাপি তিনি পূর্ণা। অনন্ত শক্তি তাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তথাপি তাঁহার স্বকীয় অনন্ত শক্তির কণামাত্রও হ্রাস হয় নাই। একথা শুনিতে বড় বিচিত্র! তোমরা আমরা জানি, ষোল আনা হইতে এক আনা বাদ পড়িলে পোনেরো আনা অবশিষ্ট থাকে, দুই আনা গেলে চৌদ্দ আনা। এইরূপ যতই বাদ

পড়িবে ততই ষোল আনা কমিতে থাকিবে। ষোল আনা বাদ পড়িলে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।

কিন্তু মহামায়ার লীলা বিচিত্র! তাঁহা হইঁতে এ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হইয়াছে। অনন্ত জীব, অনন্ত সূর্য্য চন্দ্র নক্ষত্র তারা— এক কথায় অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড অনন্ত শক্তির আভাস লইয়া তাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। মায়ের শক্তিরূপ হইতে যে সকল দেবীর উদ্ভব হইয়াছে, তাঁহারাও এক একটী অনন্তশক্তি-ধারিণী। তথাপি মা আমার যে অনন্ত সেই অনন্ত।

ঋষি বলিয়াছেন :—

পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।

পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥

এক পূর্ণ হইতে পূর্ণ উৎপন্ন হইয়াছে। পূর্ণ হইতে পূর্ণ বিযুক্ত হইয়াও পূর্ণ অবশিষ্ট রহিয়াছে।

সেই পূর্ণরূপিনী জননী এই প্রচণ্ড অসুর সংহারকালে, জগতের জীবের দুর্গতি নাশ করিতে দশ হস্ত বিস্তার করিয়া, দশভূজে দশ প্রহরণ ধরিয়া, জীবের বিপদ দশদিকে দূর করিয়াছিলেন। সেই দুর্গতিনাশিনী দশভূজাকে আমরাও কোন্ অনাদিকাল হইতে দুর্গা বলিয়া আবাহন করিয়া আসিতেছি।

দেবীর এই লোমহর্ষণ যুদ্ধের বিবরণ ঋষি যেভাবে বর্ণন করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণরূপে এই পুস্তকে প্রকাশ করা অসম্ভব। সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া এই লীলাকাহিনী সমাপ্ত করিব।

(১৫)

প্রথমে ধূম্রলোচনের সহিত যুদ্ধ। এ যুদ্ধটা তাহার সৈন্যের সহিত দেবীর সিংহের যুদ্ধ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কেন না ধূম্রলোচনকে বড় একটা যুদ্ধ করিতে হয় নাই। তাহার দম্ভ আস্ফালন মাত্রই সার হইয়াছিল।

সে ষাট হাজার দানবসেনা লইয়া দুর্গাকে বন্দিনী করিতে আসিয়াছিল। আসিয়া দেখিল, দুর্গা পূর্ব্বমত হিমালয়ের অধিত্যকায় আপনার মনে বিচরণ করিতেছেন।

ধূম্রলোচন ভাবিয়াছিল, নিশ্চয়ই দৈববল কুমারীর পৃষ্ঠরক্ষা করিতেছে। সুন্দরীকে সম্মুখে রাখিয়া দেবতারা পর্ব্বতশৃঙ্গের অন্তরালে লুকাইয়া আছে। শুম্ভও তাই বিশ্বাস করিয়াছিলেন। সেইজন্য ধূম্রলোচনকে প্রেরণকালে বলিয়াছিলেন—"সেই রমণীকে রক্ষা করিতে যদি কোন দেবতা, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব অথবা অপর কেহ যুদ্ধার্থে অগ্রসর হয়, তুমি তাহাকেও বধ করিবে।"

ধূম্রলোচন দেবীকে ভিন্ন আর কাহাকেও দেখিতে পাইল না। কেবল দেখিল, একটা কুণ্ডলিত সিংহ অধিত্যকার একস্থানে নিদ্রিতবৎ পড়িয়া আছে। সে সৈন্যগণকে পশ্চাতে রাখিয়া নিজেই দুর্গার সমীপে উপস্থিত হইল; এবং

অন্য কোন কথা না কহিয়া একেবারেই বলিল—"শুম্ভ নিশুম্ভের নিকটে চল।"

দুর্গা বলিলেন—"যদি না যাই ?"

ধূম্রলোচন বলিল—"যদি প্রীতিসহকারে আমার প্রভু শুম্ভের নিকট গমন না কর, তাহা হইলে আমি বলপূর্ব্বক তোমাকে কেশাকর্ষণে বিবশা করিয়া লইয়া যাইব।"

দুর্গা কহিলেন—"দৈত্যেশ্বর শুম্ভ তোমাকে পাঠাইয়াছে। তুমি আবার একা আগমন কর নাই, সঙ্গে কতকগুলা সৈন্য আনিয়াছ। তুমি নিজেও কম বলশালী নও—অনেক দেবতাকে যুদ্ধে হারাইয়াছ। তুমি যদি বলপূর্ব্বক আমার কেশাকর্ষণ করিয়া লইয়া যাও, আমি আর তোমার কি করিব ?"

দুর্গার এই কথা শুনিবামাত্র ধূম্রলোচন ক্রোধে আরক্তনয়ন হইয়া তাঁহাকে ধরিবার জন্য ধাবিত হইল। নিকটস্থ হইয়া যেমন সেই দুরাত্মা অসুর দেবীর কেশ ধরিবার জন্য

হস্ত প্রসারণ করিল, অমনি দুর্গা একটা হুঙ্কার প্রদান করিলেন।

এখন কোথায় দুর্দ্দান্ত অসুর ধূম্রলোচন? অসুরসেনাগণ দূর হইতে দেখিল, তাহাদের সেনাপতি দেবীর হুঙ্কারে চক্ষের নিমেষে ভস্মে পরিণত হইয়াছে। তাহারা এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল; এবং কি করিবে স্থির করিতে না পারিয়া, দুর্গার প্রতি বাণ, শক্তি, কুঠার প্রভৃতি নিক্ষেপ করিতে লাগিল।

এখন সিংহ শুইয়া শুইয়া অল্প অল্প চোখ মেলিয়া রহস্য দেখিতেছিল। কিন্তু যেই দেখিল ধূম্রলোচন মরিয়াছে, আর তার নায়ক-বিহীন সৈন্যগুলা দেবীর প্রতি অস্ত্র নিক্ষেপ করিতেছে, তখন সে আর স্থির থাকিতে পারিল না। সিংহ উঠিয়া একবার গা মোড়া দিয়া লইল, গোটা কতক হাই তুলিল, তার-পর কেশর ফুলাইয়া সেই উচ্চ অধিত্যকা

হইতে এক লম্ফে ধূম্রলোচনের সৈন্যগণের মধ্যে গিয়া পড়িল। পড়িয়াই আক্রমণে সে অসুরগুলাকে অস্থির করিয়া তুলিল। চপেটাঘাতে সে কাহারও মাথাটা উড়াইয়া দিল, কামড়দিয়া কাহারও বা মাথা গুঁড়াইয়া ফেলিল। কাহারও হাত ছিঁড়িল, কাহারও পা ছিঁড়িল, নখে কোন অসুরের পেট চিরিল; কোন মহাসুরকে বুকে পিশিয়া মারিল; কম্পিতকেশরে ভীষণ মূর্ত্তি ধরিয়া কোন অসুরের বা রক্ত পান করিতে লাগিল। অসুরসৈন্য মধ্যে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। সিংহের সঙ্গে যুদ্ধ করা সুবিধার কাজ নয় দেখিয়া তাহারা পলায়ন করিল।

ধূম্রলোচনের নিধনবার্ত্তা শুম্ভের নিকট পৌঁছিল। শুম্ভ শুনিলেন, বিনা অস্ত্রে রমণী তাঁহার মহাবল সেনাপতিকে সংহার করিয়াছে, আর তার বাহন সিংহটা তাহার ষাটহাজার সৈন্যকে তাড়াইয়া দিয়াছে।

ইহা শুনিয়াও তাহার সুমতি হওয়া উচিত ছিল। বুঝা উচিত ছিল, যাঁহার একটী বাহন ষাটহাজার দানবসেনাকে দূর করিয়া দিবার বল ধরে, সে রমণীর কত শক্তি! বুঝিয়া ক্ষমা স্বীকার করিয়া তাঁহার মায়ের শ্রীচরণে লুঠিয়া পড়া উচিত ছিল। কিন্তু দারুণ দম্ভ দৈত্যরাজকে সে কার্য্য করিতে দিল না। বরং এই যুদ্ধের সংবাদে তাঁহার ক্রোধ দ্বিগুণ জ্বলিয়া উঠিল। তিনি চণ্ডমুণ্ডকে আহ্বান করিলেন। এই চণ্ডমুণ্ড দুই ভাই শুম্ভকে দুর্গার সংবাদ দিয়াই এই অনর্থ বাধাইয়াছে।

তাহারা নিকটে আসিলে দৈত্যরাজ তাহাদিগকে আদেশ করিলেন—"হে চণ্ড! হে মুণ্ড! এখনি তোমরা সৈন্যসামন্ত লইয়া হিমালয়ে গমন কর; আর সেই দুষ্টা রমণীর কেশাকর্ষণ করিয়া, অথবা তাহাকে বন্ধন করিয়া আমার নিকটে লইয়া আইস। যদি কেশাকর্ষণ কিম্বা বন্ধন করিয়া আনিতে অপা-

রগ হও, তাহা হইলে তোমাদের সমস্ত অসুর সৈন্যের সহিত মিলিয়া তাহাকে বধ করিবে। তার সেই দুরন্ত সিংহটাকেও পিঞ্জরাবদ্ধ করিয়া লইয়া আসিবে। তাহাতে অক্ষম হইলে তাহাকেও বধ করিবে।

(১৬)

শুম্ভের আজ্ঞা পাইয়া চণ্ড ও মুণ্ড সৈন্য লইয়া দুর্গার সহিত যুদ্ধ করিতে চলিল। মা এবারে সিংহের উপর আরোহণ করিয়াছেন। চণ্ড ও মুণ্ড সসৈন্যে তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিল, সিংহবাহিনী মৃদুমধুরহাস্যে দৈত্যদের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন।

দুর্গাকে একাকিনী দেখিয়া উৎসাহের সহিত দুই ভাই তাঁহাকে ধরিবার জন্য অগ্রসর হইল। তাহারা দুর্গা ও সিংহ দুইটাকেই ধরিয়া লইবার জন্য আদিষ্ট হইয়াছে। দুর্গাকে ধরা তাহারা বড় কঠিন কার্য্য মনে করে নাই।

কিন্তু দুর্গাকে ধরিতে তাহার দুষ্ট সিংহটা যদি পলাইয়া যায়, তাহা হইলে তাহাকে ধরিতে তাহাদের বড়ই কষ্ট পাইতে হইবে। শৃঙ্গে শৃঙ্গে লম্ফ দিয়া দেখিতে দেখিতে কোন গুহাতে যে সেটা লুকাইবে যে, শত চেষ্টাতেও তাহারা তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিবে না। চণ্ড ও মুণ্ডের সেইটাই যেন বড় ভাবনার বিষয় ছিল। এখন সিংহটাকে ভগবতীকে পৃষ্ঠে বহন করিতে দেখিয়া তাহাদের বড় আহ্লাদ হইল। দুইটাকে একসঙ্গে ধরিবার সুযোগ দেখিয়া দুই ভাই দেবীর দিকে বেগে ধাবমান হইল। প্রচণ্ড অসুর সৈন্য, নানা অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

তাহাদিগকে দেখিবামাত্র দুর্গার বিষম ক্রোধ উপস্থিত হইল। তাঁহার যে সুন্দর বদন শতচন্দ্রের দ্যুতিতে এতক্ষণ ত্রিভুবন মোহিত করিতেছিল, অসুরের উপর ক্রোধে

সহসা তাহা কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিল। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ভ্রুকুটী কুটিল ললাট হইতে—

করালবদনা কালী, অসিপাশ দু'টী ভুজে তার,
বিচিত্র মুদ্গর করে, চারুগলে নরশির হার ;
ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান, শুষ্ক মাংস, অতীব ভীষণা,
বিলোলরসনা ভীমা অতিশয় বিস্তার-বদনা ;
কোটরে প্রবিষ্ট আঁখি সদা তাহে শোণিত-স্ফুরণ,
দশদিক আপূরিত কি প্রচণ্ড ভৈরব গর্জ্জন !

আঁধার বরণা এক অপরূপা দেবী প্রাদুর্ভূতা হইলেন। প্রাদুর্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি অতি বেগে দৈত্য সৈন্যের উপরে পতিত হইলেন ; এবং তাহাদিগকে ধরিয়া ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। হাতী ধরিয়া, সেই হাতী, তাহার পিঠের যোদ্ধা ও মাহুত— সমস্ত খাইতে লাগিলেন। এইরূপে ঘোড়-সওয়ার সমেত ঘোড়া, সারথী সমেত রথ, যাহা যখন সম্মুখে পড়িতে লাগিল, তাহাই মুখে পুরিয়া, কড়মড় করিয়া চিবাইয়া পেটে পুরিতে

লাগিলেন। চণ্ডমুণ্ড এ এক নূতন বিপদ দেখিয়া দুর্গাকে পরিত্যাগ করিয়া সমস্ত অসুর সৈন্য লইয়া সেই কৃষ্ণবর্ণা দেবীকে আক্রমণ করিল।

দেবী তাহাদের নিক্ষিপ্ত অস্ত্র সকল দন্ত দ্বারা চূর্ণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার আহারের ব্যাপার দেখিয়া অসুর সকল পলাইতে আরম্ভ করিল। কিন্তু সেই সংহারিণী মূর্ত্তির নিকট হইতে কোথায় পলাইয়া তাহারা নিস্তার পাইবে? দেবী তাহাদিগকে হত্যা করিতে করিতে চণ্ডের নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং তাহার কেশ আকর্ষণ পূর্ব্বক খড়্গ দ্বারা তাহার শিরশ্ছেদ করিলেন।

চণ্ডকে নিহত দেখিয়া মুণ্ড অস্ত্র লইয়া দেবীর দিকে অগ্রসর হইল; এবং অবিলম্বেই ভ্রাতার দশা প্রাপ্ত হইল।

দুই মুণ্ড হস্তে হইয়া কালী দুর্গাকে উপহার দিলেন। সেই দুই মহাসুরকে নিহত দেখিয়া কল্যাণময়ী জগজ্জননী তাঁহাকে বলিলেন,

"যেহেতু তুমি চণ্ড ও মুণ্ডকে লইয়া আসিয়াছ, এইজন্য আজি হইতে হে দেবি! জগতে তোমার চামুণ্ডা নাম প্রসিদ্ধ হইল।

(১৭)

এইবারে শুম্ভ ও নিশুম্ভের পালা। চণ্ড ও মুণ্ডের নিধনবার্ত্তা শুনিয়াই দৈত্যরাজ দেবীর বধার্থ, যেখানে যত দৈত্য ছিল, সকলকেই প্রস্তুত হইতে বলিলেন। তাঁহার আজ্ঞামাত্র সমরের বিপুল আয়োজন আরম্ভ হইল।

দৈত্য সামন্তেরা তাহাদের সম্রাটের সহিত এই প্রচণ্ড যুদ্ধে যোগদান করিতে আসিল। কালক বংশীয়, মুর বংশীয়—এইরূপ নানা বংশের অসুরগণ যুদ্ধ করিতে ছুটিয়া আসিল।

সেই অগণ্য সৈন্যের সেনাপতি হইয়া, ভাই নিশুম্ভকে সঙ্গে লইয়া শুম্ভ দুর্গার বিরুদ্ধে যুদ্ধ-যাত্রা করিলেন।

অতি ভীষণ সেই সৈন্যকে আসিতে দেখিয়া

দেবী ধনুষ্টঙ্কার শব্দে ধরণী ও গগনের অন্তর পূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। সিংহ ক্রোধে কেশর ফুলাইয়া অতি মহান্ শব্দ করিল। মা দুর্গতি-নাশিনী ঘণ্টাধ্বনিতে সেই শব্দ দ্বিগুণ করিয়া তুলিলেন। বিস্তারিতবদনা চামুণ্ডা এরূপ ভয়ঙ্কর শব্দে দিঙ্‌মণ্ডল পরিপূর্ণ করিয়া ফেলিলেন যে, ভগবতী দুর্গার ধনুষ্টঙ্কার ও ঘণ্টাধ্বনি এবং সিংহের প্রচণ্ড গর্জ্জন ও তাহার ভিতরে ডুবিয়া গেল!

বাস্তবিক দেবতারা অন্তরাল হইতে মায়ের এই যুদ্ধ ব্যাপার দেখিতেছিলেন। অন্তরালে থাকিয়াই তাঁহারা ধূম্রলোচন ও চণ্ডমুণ্ডের বধে আনন্দপ্রকাশ করিতেছিলেন। কিন্তু সমস্ত দৈত্যবল সঙ্গে স্বয়ং শুম্ভকে আসিতে দেখিয়া তাঁহারা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তাঁহারা বুঝিলেন, আদ্যাশক্তির যে শক্তিপ্রসাদে তাঁহারা এতদিন নিজ নিজ অস্তিত্ব রক্ষায় সমর্থ হইয়াছিলেন, আজ সেই মাতৃদত্ত

শক্তি প্রচণ্ড দানবের সংহার কার্য্যে মায়ের সাহায্যেই প্রয়োগ করিবার প্রয়োজন হইয়াছে।

দেবতাদিগের মানসে এই কথা উদিত হইবামাত্র, তাঁহাদের অন্তর্নিহিত শক্তি সমূহ মুহূর্ত্ত মধ্যে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া আদ্যাশক্তিকে ঘেরিয়া ধরিলেন। যে যে দেবের যেমন রূপ, যাহার যেমন ভূষণ, যেমন বাহন, সেই প্রকার রূপ ধরিয়া, ভূষণ পরিয়া, বাহনে আরূঢ়া হইয়া, সেই সেই দেবের শক্তিরূপা দেবীগণ অসুরদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে আগমন করিলেন। হংসযুক্ত বিমানে আরোহন করিয়া অক্ষসূত্র কমণ্ডলুকরা ব্রহ্মার শক্তি ব্রহ্মাণী; বৃষারূঢ়া ত্রিশূলধারিণী সর্প-বলয়া চন্দ্ররেখা-বিভূষণা মহেশ্বরের শক্তি মাহেশ্বরী; শঙ্খ চক্র প্রভৃতি অস্ত্র হস্তে, গরুড়ের পৃষ্ঠে উপবিষ্টা নারায়ণের শক্তি নারায়ণী; ইন্দ্রের শক্তি ইন্দ্রানী; কার্ত্তিকেয়ের শক্তি ময়ূরাসনা কৌমারী—এইরূপ

সর্ব্বদেবতার শক্তি শুম্ভসংহারে সহায়তা করিতে আত্মাশক্তিকে বেষ্টন করিলেন। শুম্ভ রণাঙ্গনে প্রবিষ্ট হইয়াই দেখিলেন, তাহার প্রতিযোগিনী রমণী আর কেহ নহেন, তিনি সর্ব্বশক্তি পরিবৃতা সর্ব্বশক্তির সারভূতা স্বয়ং অপরাজিতা ঈশানী।

আত্মাশক্তিকে সংহারে উদ্যতা দেখিয়া শুম্ভের ক্রোধের সীমা রহিল না। ত্রিলোকের উপর তাঁহার আধিপত্য। সুতরাং দৈত্যরাজ শুম্ভও অনন্ত শক্তিধর। আজীবন শক্তির সাধনায় তাঁহার এই সমস্ত ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তি হইয়াছে। অতএব সম্মুখস্থিতা শক্তির অধিষ্ঠাত্রীকে দেখিয়া ভক্তিভরে তাঁহার পদপ্রান্তে শুম্ভের পতিত হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু অহঙ্কারই দৈত্যবলের সর্ব্বপ্রধান উপাদান। শুম্ভ আপনাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শক্তিধর স্থির করিয়া গর্ব্বে ফুলিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন। অতি অহঙ্কারে যে দেবী হইতে তিনি শক্তি লাভ

করিয়াছিলেন, সেই ঈশ্বরীকে তিনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন। এখন তাঁহার পৃথক অস্তিত্ব দেখিয়া শুম্ভের প্রাণ জ্বলিয়া উঠিল। তিনি দুর্গার ধ্বংস সাধনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। এবং সমস্ত অসুরবল একত্র করিয়া দেবীকে আক্রমণ করিলেন।

সে ভীষণ যুদ্ধের বর্ণনা আর কি করিব! সে বহুকালব্যাপী যুদ্ধের ফলে সমগ্র জগতের মূর্ত্তি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। যেখানে নগর ছিল, সেখানে সাগর হইয়াছে; যেখানে সাগর ছিল সেখানে নগর বসিয়াছে। কত হ্রদ শৈলে পরিণত হইয়াছে; কত শৈল সাগরে ডুব দিয়াছে; কত তারা কক্ষচ্যুত হইয়াছে।

জগতে কিছুকাল ধরিয়া প্রশ্ন উঠিয়াছিল কে জিতিবে? কোন্ শক্তি একে অন্যের বিনাশ সাধন করিবে? দৈবী না দানবী?

উগ্রকর্ম্মা দানব বহুবার ভগবতী শক্তিকে বিধ্বস্তপ্রায় করিয়াছিল। বহুবার বিরাট অন্ধ-

কার আলোককে উদরস্থ করিবার প্রয়াস পাইয়াছিল। দেবতারা একান্তে বসিয়া বহুবার আত্মনিধন আশঙ্কায় কম্পান্বিত হইয়াছিলেন।

বহুবার তাঁহারা দেখিয়াছিলেন, দানব মরিয়াও মরে না। মরিয়া, আবার কেমন করিয়া দ্বিগুণ বল হইয়া বাঁচিয়া উঠে! দ্বিগুণ বলে সে আবার মহামায়ার দিকে ধাবিত হয়! তাঁহারা দেখিয়াছিলেন, কোন দানব রক্তবীজ। তাহার মৃত্যু তাহার জীবন হইতেও অধিকতর ভয়াবহ! ইন্দ্রানীর বজ্রে, নারায়ণীর চক্রে, মাহেশ্বরীর ত্রিশূলে কতবার সে গতপ্রাণ হইয়া ভূমিতে পড়িল; কিন্তু তাহার রক্তবিন্দু ভূমিতে পড়িবামাত্র, প্রতি রক্তবিন্দু হইতে তাহারই তুল্য প্রভাব তাহারই তুল্য দেহশক্তি লইয়া এক এক পুরুষ উৎপন্ন হইল। মৃত্যুতে এক রক্তবীজ শত শত রক্তবীজে পরিণত হইল!

অনেক আয়াস স্বীকার করিয়া জগন্মাতা এই সকল দৈত্যকুলের সংহার করেন। রক্ত-

বীজকে বধ করিতে তিনি দেবী চামুণ্ডাকে বদন বিস্তার করিতে আদেশ করেন। রক্তবীজের দেহ হইতে যে সকল শোণিতবিন্দু পতিত হইতে লাগিল, ভূমিতে পড়িবার পূর্ব্বেই তাহা তিনি পান করিতে আরম্ভ করিলেন। সুতরাং সে সকল রক্তবিন্দু হইতে অন্যযোদ্ধা উৎপন্ন হইবার উপায় রহিল না। দুর্গা নানা অস্ত্র দিয়া রক্তবীজকে আঘাত করিতে লাগিলেন, আর চামুণ্ডা কেবল রক্তপানে নিযুক্তা রহিলেন। রক্তবীজ শস্ত্রদ্বারা আহত ও রক্তহীন হইয়া অবশেষে ভূতলে পতিত হইল।

ইন্দ্রানী প্রভৃতি যে সকল দেবী দুর্গাকে সাহায্য করিতে আসিয়াছিলেন, পুরাণে তাঁহাদের নাম অষ্ট-মাতৃকা। এই মাতৃকাগণের শক্তি সাহায্য লইয়া তিনি নিশুম্ভকে বধ করিলেন।

শুম্ভ এইবারে মহামায়ার সংহারে কৃত-সঙ্কল্প হইলেন। প্রাণতুল্য ভ্রাতাকে নিহত

দেখিয়া, প্রাণের মমতা পরিত্যাগপূর্ব্বক দৈত্যে-শ্বর মহাক্রোধে দেবীকে আক্রমণ করিলেন। সঙ্কট বুঝিয়া অষ্টশক্তি মাতৃরক্ষার্থ চতুর্দ্দিকে দুর্গ-প্রাচীরের ন্যায় দুর্গাকে বেষ্টন করিয়া রহিলেন। করালবদনা চামুণ্ডা অসিপাশ হস্তে লইয়া, মুণ্ডমালা গলে পরিয়া দুর্গদ্বার-রক্ষিণীর ন্যায় মায়ের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াই-লেন।

শুম্ভ দুর্গার নিকটে আসিয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

"বলাবলেপ দুষ্টেত্বং মা দুর্গে গর্ব্বমাবহ।
অন্যাসাং বলমাশ্রিত্য যুধ্যসে যাতিমানিনী॥

বলগর্ব্ব দুর্ব্বিনীতে দুর্গে! তুমি গর্ব্ব করিও না। অতিমানিনী হইয়াও তুমি অপরের সাহায্য লইয়া যুদ্ধ করিতেছ।

এই কথা শ্রবণমাত্র দুর্গা কহিলেন—

একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কামমাপরা।
পশ্যৈতা দুষ্টময্যেব বিশন্ত্যো মদ্বিভূতয়ঃ॥"

এই জগতে একমাত্র আমিই আছি, আমি ব্যতীত দ্বিতীয় আর কে আছে? রে দুষ্ট! দেখ্, আমার বিভূতিরূপা এই সকল মাতৃগণ আমাতেই প্রবেশ করিতেছে।

যেমন মায়ের মুখ হইতে এই অপূর্ব্ব বাক্য বহির্গত হইল, অমনি অষ্টমাতৃকা—মায়ের দেহে লয় প্রাপ্ত হইলেন। মা দুর্গা একাকিনীই রণক্ষেত্রে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তদবস্থায় তিনি শুম্ভকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"নিজের যে ঐশ্বর্য্য বলে আমি ক্ষণপূর্ব্বে বহুরূপে অবস্থিতা ছিলাম, সে ঐশ্বর্য্য এই আমি আত্মদেহে বিলীন করিলাম। এক্ষণে যুদ্ধে আমি একাকিনীই রহিলাম; তুমি স্থির হও।"

একদিকে দেব অন্যদিকে দানবগণ দাঁড়াইয়া ঐশ্বরিক ও দানবী শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখিতে লাগিল।

শুম্ভ অনেক সময়ে দুর্গাকে বিব্রত করিয়া-

ছিলেন। শুম্ভের নিক্ষিপ্ত মহাস্ত্র সকল দেবী যেরূপ ছিন্ন করিতে লাগিলেন, শুম্ভও সেইরূপ দেবী-নিক্ষিপ্ত অস্ত্র সকল খণ্ডখণ্ড করিতে লাগিলেন। বহুকাল পর্য্যন্ত যুদ্ধে কেহ কাহাকেও পরাস্ত করিতে সমর্থ হইলেন না।

শুম্ভ কঠোর তপস্যায় এই অসীম শক্তি সঞ্চিত করিয়াছিলেন। তপস্যার ক্ষয় না হইলে ত তাহার বিনাশ হইবে না! ইহা ভগবানের বিধি। এই জন্য দুর্গা তাহাকে সহজে পরাস্ত করিতে পারিলেন না। কিন্তু মৃত্যু দৈত্যরাজের সন্নিকট হইয়াছিল, কাল তাঁহাকে গ্রাস করিবার জন্য অগ্রসর হইতে-ছিল। দৈত্যরাজ অবশেষে নিজের মৃত্যু নিজেই ডাকিয়া আনিলেন। তিনি যুদ্ধ করিতে করিতে এক সময় দুর্গাকে দুর্ব্বল বুঝিয়া বিনাশের জন্য তাঁহার কেশাকর্ষণ করিলেন। কেশাকর্ষণে নিজের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিলেন।

সতীর কেশস্পর্শমাত্র তাঁহার সর্ব্বশক্তির বিলয় হইল। বজ্রশক্তি যেমন পৃথিবীকে স্পর্শ করিলেই তাহাতে বিলীন হইয়া যায়, শুম্ভেরও শক্তি সেইরূপ দুর্গার দেহে লীন হইয়া গেল। এই অবকাশে দেবী শূলদ্বারা তাঁহার বক্ষবিদারিত করিয়া তাহাকে ভূতলে পাতিত করিলেন। দেবীর শূলাগ্রদ্বারা বিক্ষত দৈত্যরাজ প্রাণহীন হইয়া সসাগরা সদ্বীপা সপর্ব্বতা পৃথিবী কম্পিত করিয়া ভূতলে পতিত হইলেন।

শুম্ভের নিধনে জগৎ প্রসন্ন ও সুস্থ হইল; আকাশ নির্ম্মল হইল; উল্কাবর্ষী মেঘ শান্ত হইল; এবং নদী সকল প্রকৃত পথে প্রবাহিত হইতে লাগিল। দেবগণ পরমানন্দিত হইলেন; গন্ধর্ব্বগণ গানে, অপ্সরাগণ নৃত্যে, সমস্ত জগৎকে পরিতৃপ্ত করিলেন। সুখদ বায়ু প্রবাহিত হইল; সূর্য্যের তৃপ্তিপ্রদ কিরণ উল্লাসে ধরণীকে স্নান করাইল।

ঋষি সুরথ রাজাকে বলিলেন—"মহারাজ এই আমি তোমাকে দেবীমাহাত্ম্য কহিলাম। এই বিষ্ণুমায়া বা মহামায়ার প্রভাবের তুলনা নাই। সেই মহামায়া দেবী তোমাকে, এই বৈশ্যকে এবং তোমাদিগের ন্যায় যাহারা বিবেকের অহঙ্কার করে এইরূপ অন্যান্য জনগণকে মোহিত করিয়া রাখিয়াছেন, এখনও মোহিত করিতেছেন এবং ভবিষ্যতে মোহিত করিবেন। হে মহারাজ! সেই পরমেশ্বরীকে আশ্রয়রূপে অবলম্বন কর।

মেধসমুনির বাক্য শ্রবণ করিয়া সুরথ ও সমাধির শোকসন্তাপ দূর হইয়া গেল। তাঁহারা উভয়েই সেই তপস্বী ও ব্রতধারী ঋষিকে প্রণাম করিয়া তপস্যা করিতে প্রস্থান করিলেন।

তাঁহারা উভয়ে এক নদীতটে শ্রীদুর্গার মৃন্ময়ী মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পুষ্পধূপ হোম ও তর্পণাদি দ্বারা তাঁহার পূজা করিয়াছিলেন।

তাঁহাদের পূজায় পরিতুষ্টা জগদ্ধাত্রী প্রত্যক্ষ হইয়া তাঁহাদিগকে বর দান করিয়াছিলেন।

ভগবতীর বরে রাজা তাঁহার হৃতরাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন ; এবং উভয়েই দিব্যজ্ঞান ও অনন্ত শান্তি লাভ করিলেন।

আমাদের দেশে বর্ষে বর্ষে ভগবতীর যে পূজা হয়, রাজা সুরথই তাহার প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। তবে শুনা যায়, বসন্তকালে তিনি শ্রীদুর্গার পূজা করিতেন। অযোধ্যাপতি ভগবান রামচন্দ্র রাবণকে সবংশে বধ করিবার সঙ্কল্প করিয়া শরৎকালে মায়ের আবাহন করিয়াছিলেন। তদবধি প্রতি শরতে আমাদের দেশে আদ্যাশক্তি মহামায়ার আবাহন চলিয়া আসিতেছে।

মহামায়ার এই চরিত্র শ্রবণে পুণ্য আছে। মা নিজেই বলিয়াছেন,—যাহারা ভক্তিসহকারে আমার এই উৎকৃষ্ট মাহাত্ম্য শ্রবণ করিবে, তাহাদের কিছুমাত্র পাপ থাকিবে না, বিপদ

থাকিবে না, দারিদ্র্য থাকিবে না, প্রিয়বিয়োগ ঘটিবে না। আমার এই মাহাত্ম্য সর্ব্বদা একাগ্রচিত্তে ও ভক্তিসহকারে পাঠ ও শ্রবণ করা উচিত; ইহাই কল্যাণের পথ।

এই আমি তোমাদিগের নিকট শ্রীদুর্গার বিচিত্র কাহিনী বর্ণন করিলাম। এ কাহিনী বাস্তবিকই বিচিত্র। বর্ত্তমান জড়বাদের যুগে ইহাকে বিশ্বাস করিতে ইতস্ততঃ করিতে হয়। কিন্তু ভক্তগণ মায়ের এই অদ্ভুত চরিত্র আপনারা শুনিয়া ও অপরকে শুনাইয়া সমস্ত জীবন আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকেন। ধন, মান, ঐশ্বর্য্য, যশ সমস্ত উপেক্ষা করিয়া তাঁহারা দীনবেশে মহামায়ার এই মহাশক্তির লীলা জগতের সমক্ষে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। লোকনিন্দা তাঁহারা কানে তুলেন নাই, অত্যাচার গ্রাহ্য করেন নাই, অভক্ত তার্কিকের শুষ্কতর্কে বিচলিত হন নাই।

সহস্রবাধা, সহস্রবিঘ্ন, কত যুগপ্রলয় অতি-

ক্রম করিয়া, মহামায়ার ইতিহাস-কথা এখনও পর্য্যন্ত হিন্দুর স্মৃতিসরোবরে চিরপ্রফুল্ল কমল-মাধুর্য্যে ফুটিয়া রহিয়াছে। বর্ত্তমান যুগশিক্ষায় শিক্ষিত হইয়াও, হিন্দু তাহা ভুলিতে পারিল না।

তাহারা এখনও মনে করে, দশদিক-ব্যাপিনী শক্তি লইয়া সনাতনধর্ম্মের বীজমন্ত্র এই মৃণ্ময়ী দশভুজার হৃদয়মধ্যে লুকাইয়া আছে। তাই মাতৃ-ভক্ত পূজান্তে ভক্তিগদ্‌গদ-কণ্ঠে জগজ্জননী দুর্গতিনাশিনীকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়া থাকেন—

দেবি প্রপন্নার্ত্তিহরে প্রসীদ
প্রসীদ মাত র্জগতোঽখিলস্য।
প্রসীদ বিশ্বেশ্বরি পাহি বিশ্বং
ত্বমীশ্বরী দেবি চরাচরস্য॥

হে শরণাগতদুঃখনাশিনী দেবি, তুমি প্রসন্না হও; হে অখিল জগতের জননি তুমি প্রসন্না হও; হে বিশ্বেশ্বরি তুমি প্রসন্না হও;

সমুদয় জগৎ পালন কর; হে দেবি তুমি চরাচর জগতের ঈশ্বরী।

ভক্ত আপনাকে ভুলিয়া গিয়া চিরদিন জগতের কল্যাণের জন্যই ব্যাকুল হইয়াছেন। কেবল বলিয়াছেন—সমুদয় জগৎ পালন কর।

শ্রীদুর্গার আগমনে তোমরা ঢাক ঢোলের বাদ্যে আনন্দ প্রকাশ কর; ক্ষুধার্ত্ত মায়ের প্রসাদ প্রাপ্তির আশায় আনন্দ প্রকাশ করে; গৃহস্থ তাহাদিগকে ভোজন করাইয়া আনন্দ প্রকাশ করেন। কিন্তু তোমরা ত জান না—ওই উপবাসী শীর্ণকায় ব্রাহ্মণ শ্রীদুর্গার প্রতিমার পার্শ্বে বসিয়া, একখানি তালপত্রের পুঁথি পাঠ করিতে করিতে কি অতুল আনন্দ উপভোগ করে! ওই তালপত্রের পুঁথিটী শ্রীদুর্গার লীলাকথায় পরিপূর্ণ। ব্রাহ্মণ সেই লীলাগানে তন্ময়। সেই পবিত্র কাহিনী বর্ণনায় পাছে একটীও পবিত্র অক্ষর ভ্রষ্ট হয়, সেই ভয়ে সংযতচিত্ত ভক্ত পুস্তিকায় নিবদ্ধ-দৃষ্টি—সংসার

ভুলিয়া বসিয়া রহিয়াছেন! ক্ষুধাতৃষ্ণা তাঁহার কাছে আসিতে ভুলিয়া গিয়াছে, লোককোলাহল কতবার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইতে গিয়া পরাস্ত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে!

এস ভাই! আমরাও সকলে মিলিয়া ভক্তগণের পদাঙ্কানুসরণ করিয়া জগন্মাতার আবাহনকল্পে করজোড়ে বলি:—এস দুর্গে, এস জগদম্বিকে নারায়ণি! সংসারক্লেশদগ্ধ তোমার পুত্রকন্যাগুলির কল্যাণসাধনের জন্য একবার আমাদিগের গৃহে এস। এস মা কল্যাণরূপে, সম্পদ্‌রূপে, সিদ্ধিরূপে; এস মা প্রতিষ্ঠারূপে, লক্ষ্মীরূপে, শক্তিরূপে; এস মা তোমার চিরপ্রিয় বালকবালিকার পরমপ্রিয় মাতৃরূপে। শ্রীচরণ স্পর্শে আমাদিগের গৃহ পবিত্র কর। ভক্তি প্রীতি চেতনা ও শক্তি দান করিয়া আমাদিগের সংসারকে দেবসংসারে পরিণত কর। তোমার কৃপায় তোমার ভক্তগণের গৃহে চিরসুখ চিরশান্তি বিরাজ করুক।

দুর্গা

সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥
শরণাগত-দীনার্ত্ত-পরিত্রাণ-পরায়ণে।
সর্ব্বস্যার্ত্তিহরে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥
সর্ব্বস্বরূপে সর্ব্বেশে সর্ব্বশক্তি সমন্বিতে।
ভয়েভ্য স্ত্রাহি নো দেবি দুর্গে দেবি নমোঽস্তুতে॥

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম, এ

প্রণীত

গ্রন্থাবলী।

নাটক।

(ঐতিহাসিক)

(১) প্রতাপাদিত্য—বেঙ্গলী দুই স্তম্ভব্যাপী সমালোচনায় বলিয়াছেন, "ইহা যথার্থতঃ বাঙ্গালীর জাতীয় নাটক। 'বিজয়া' বাঙ্গালার মর্ম্মনিহিতা শক্তি; প্রতাপ তাহার সাধক, সূর্য্যকান্ত গুহ উত্তর সাধক; শঙ্কর চক্রবর্ত্তী পুরোহিত।" মূল্য, এক টাকা।

(২) পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত—নবাব মীরকাসিমের প্রাণকে প্রস্ফুটিত করিবার জন্যই যেন শক্তিময়ী 'বিজয়া' এবারে নর্ত্তকীরূপে বীর মোহনলালের কন্যা হইয়া জন্মিয়াছেন। পিতা ও পুত্রী মুরশিদাবাদের উদ্যানে বসিয়া পলাশীর রণক্ষেত্র সম্বন্ধে যে কথোপকথন করিয়াছিলেন, নাটকের সেই অংশটুকু পাঠ

করিলেই যুগের চিন্তা আসিয়া পাঠককে এক স্বপ্ন-রাজ্যে বহন করিয়া লইয়া যাইবে। মূল্য, এক টাকা।

(৩) নন্দকুমার—ইহা মহারাজা নন্দকুমারের জীবন্ত চিত্র। আজ দেড়শত বৎসর পরে, সপ্ততি-বর্ষীয় স্থবির নিজের সমস্ত দুঃখ কাহিনী লইয়া উন্মুক্ত হৃদয়ে আপনাদের সমক্ষে উপস্থিত হইবেন। মূল্য, এক টাকা।

শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল নিউইণ্ডিয়াতে লিখিয়াছেন—'প্রতাপাদিত্য' অপূর্ব্বগ্রন্থ হইলেও, 'পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত' নাটকত্বে তাহা হইতে উৎকৃষ্ট; কিন্তু 'নন্দকুমার' তাঁহার নাটকীয় শক্তির পরাকাষ্ঠা।

(৪) পদ্মিনী—বাংলা হইতে কিঞ্চিৎ দূরে, মাতৃ-ভূমির অপরাংশে শ্রেষ্ঠবীরগণের লীলাভূমি চিতোরের শ্রেষ্ঠ সুন্দরী, মহীয়সী রমণী পদ্মিনী; আর সেই মাতৃ-ভূমির পূজক গোরা ও দ্বাদশ বর্ষীয় বালক বাদল!

স্বনাম-ধন্য মহানুভব সর্ব্বপরিচিত ব্যারিষ্টার সুকবি শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস পদ্মিনীর অভিনয়ে সম্রাট আলাউদ্দীনের চিত্র দেখিয়া বলিয়াছেন—"এরূপ অদ্ভুত চরিত্র প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সমস্ত নাট্য সাহিত্যে নূতন।" মূল্য, এক টাকা।

(৫) চাঁদবিবি—দাক্ষিণাত্যে বিজাপুরের রাণী, আমেদনগরের রাজনন্দিনী—রমণীকুলের ভূষণ স্বরূপা চাঁদসুলতানার চরিত্র পাঠে শুধু আনন্দ নয়, পুণ্য আছে। মূল্য, এক টাকা।

হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি শ্রীযুক্ত শারদা-চরণ মিত্র মহোদয় লিখিয়াছেন—"বালেশ্বরের সমীপে সমুদ্রতীরে এক নির্জ্জন কুঞ্জে বসিয়া তোমার চাঁদবিবি পাঠ করিলাম। সমুদ্রোর্ম্মী ও তোমার ভাষার তরঙ্গ, মধ্যে বসিয়া আনন্দানুভবের এই উপযুক্ত স্থান।"

বন্দেমাতরং সম্পাদক শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ মহাশয় অভিনয় দেখিয়া এই কয়খানি নাটক সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"এই অপূর্ব্ব পুস্তকগুলি স্বদেশের উন্নতি কল্পে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে। বাংলার শত শত স্থানে অভিনীত হওয়ায় লক্ষ লক্ষ লোক (millions) ইহা দ্বারা বাঙ্গালীর মহিমা অবগত হইয়াছে।"

(কিংবদন্তী)

(৬) রঙ্গাবতী—ধর্ম্মমঙ্গল অবলম্বনে বিষ্ণুপুর ও অম্বিকানগরের পুরাকাহিনী লইয়া লিখিত। সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বের স্বাধীন বাঙ্গালার অভ্যন্তরীণ

অবস্থা, এবং তৎকালীন ডোম বাগ্‌দী প্রভৃতি নীচ জাতীয় বাঙ্গালীর স্বদেশনিষ্ঠা, প্রভুভক্তি ও অমানুষিক বীরত্বের যদি আভাস জানিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে এই পুস্তক পাঠ করুন। মূল্য, একটাকা।

(পৌরাণিক)

(৭) সাবিত্রী—ক্ষীরোদ বাবুর 'সাবিত্রীর' নূতন পরিচয় দিতে হইবে না। নাটকে এরূপ মধুর চরিত্র অতি অল্পই আছে। হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি শ্রীযুক্ত সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছেন—"আপনার পবিত্র লেখনীর উপযুক্ত—অপূর্ব্ব—গম্ভীর।"

(৮) উলূপী বা বভ্রুবাহন—এক উলূপী চরিত্র দেখিলেই বুঝিবেন, ভারতীয় যুগে বাঙ্গালা জননী কিরূপ ছিলেন, আর এখন তিনি দেশের দুর্ভাগ্যে কিরূপ হইয়াছেন। বঙ্গবাসী বলিয়াছেন—"ইহার চরিত্র সেক্‌স্‌পিয়রের চরিত্রের সঙ্গে তুলনীয়।"

(ঔপন্যাসিক)

(৯) জুলিয়া—মধুর সংযোগান্ত নাটক—পড়িলে ভাব স্রোতে ভাসিয়া যাইতে হয়। ইহার রস মাধুর্য্য

ক্ষীরোদবাবুর সমস্ত নাটককে পরাস্ত করিয়াছে। মূল্য, বার আনা।

(১০) দৌলতে দুনিয়া—অলৌকিক ব্যাপার লইয়া লিখিত। ভাষা ও ভাবের লালিত্যে শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে মধুরতায় প্রাণ পূরিয়া যাইবে। মূল্য আট আনা।

রঙ্গনাট্য।

(১১) আলিবাবা—লক্ষ লক্ষ লোকে ইহার অভিনয় দেখিয়াছেন; কিন্তু বাঁদী মরজিনার হাবভাব নৃত্যের মধ্যে তাহার গাম্ভীর্য্য তেজস্বিতা ও ধর্ম্ম কয়জন লক্ষ্য করিয়াছেন? মূল্য, আট আনা।

(১২) বেদোয়া—এরূপ হাস্যরসোদ্দীপক নাটক অতি অল্পই আছে। ইহার গান বড়ই মধুর। মূল্য, আট আনা।

রূপক নাট্য।

(১৩) প্রমোদ রঞ্জন—রূপক নাট্য বলিলে, একটা দুর্ব্বোধ্য ব্যাপার বুঝিবেন না। এমন সুকৌশলে গ্রন্থকার "শান্তি" ও "মুক্তি" দুইটী সখীকে প্রাণময়ী প্রতিমারূপে গড়িয়া "মানুষ" খুঁজিয়া উপহার দিয়াছেন

যে, সহস্র সহস্র দর্শক তাঁহাদের মূর্ত্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। ইহার এক একটী গান এক একটী কোহিনুর। মূল্য, আট আনা।

গীতিনাট্য।

(১৪) বৃন্দাবন-বিলাস—বৈষ্ণব কবিগণের রত্ন সংগ্রহ করিয়া একটী মালিকা রচনা করা হইয়াছে। গানগুলি সাজাইবার কৌশলে ইহা একখানি সুখপাঠ্য নাটক। মূল্য, ছয় আনা।

(১৫) বরুণা—ইদানীং এরূপ সরস নাটক দেখিতে পাওয়া দুর্লভ। সহস্র সহস্র লোক ইহার অভিনয় দেখিয়া, ইহার অলৌকিক গল্পচাতুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া, ইহাকে গীতিনাট্যের শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। মূল্য, আট আনা।

প্রহসন।

(১৬) দাদা ও দিদি—প্রহসন শুনিলেই লোক বিশেষের কুৎসা মনে করিবেন না। তবে যিনি চারি আনা অপব্যয় করিতে সাহস করেন, তিনি 'চন্দ্রদ্বীপ' হইতে 'হট্টমালা'র দেশে সুস্বাগত এই 'দাদা' ও

'দিদিকে' দেখিয়া তৃপ্তি লাভ করিতে পারিবেন। মূল্য, চারি আনা।

নক্সা।

(১৭) বাসন্তী—হাস্যরসের আধার, বাসন্তী শোভার মেলা, দুঃখে শান্তি—বাসন্তী। মূল্য, চারি আনা।

(১৮) ভূতের বেগার—এতকাল চাকরী করিয়া আমরা কেবল ভূতের বেগার দিতেছি; এবং বংশধরদিগের ভবিষ্যৎ চিন্তায় মৃত্যুকে ভীষণতর করিয়া তুলিতেছি। তবে কি আমাদিগকে এ বিষম চিন্তার হাত হইতে রক্ষা করিতে কেহ নাই? মুক্তিদায়িনী আমাদিগের অপেক্ষা করিতেছেন। শুধু ভক্তিসহকারে, আমাদিগের তাঁর শরণ লইবার প্রয়োজন। গ্রন্থকার নিজে লইয়া আপনাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন। মূল্য, চারি আনা।

কাব্যনাট্য।

(১৯) রঘুবীর—প্রবল অত্যাচারীর উৎপীড়নে, বীর প্রকৃতি সাধু পরিণামে কিরূপে দস্যু হইয়াছিল, তাহার একটী উজ্জ্বল প্রাণময় চিত্র। ভাবুক যুবকের

সর্ব্বতোভাবে দ্রষ্টব্য। শুধু তাই নয়, অভিনীত করিয়া অপরকে দেখানও কর্ত্তব্য। শ্রবণ বিমোহন ছন্দ—স্বর্গীয় ভাবস্রোত, চরিত্রাঙ্কণে অসাধারণ কৌশল। মূল্য, এক টাকা।

(২০) অশোক—জগতের শ্রেষ্ঠ সম্রাট আমাদেরই ঘরের রাজর্ষি মহারাজ অশোকের চরিত্রাবলম্বনে। আলেক্জাণ্ডার, সীজার, নেপোলিয়ান, অল্প শিক্ষিতের কাছেও পরিচিত; অথচ মহারাজ অশোক আমাদের হারাইয়া শোকার্ত্ত। এ সম্বন্ধে আমাদের বলিবার কিছুই নাই। যাঁহার অভিরুচি হইবে। মূল্য, এক টাকা।

উপন্যাস।

(২১) নারায়ণী—সিপাহী বিদ্রোহকালীন ছোট-নাগপুরের একটী ঘটনা অবলম্বনে লিখিত। ইহাই যথার্থ গ্রন্থকারের প্রথম উপন্যাস। কিন্তু এরূপ লোমহর্ষণ উপন্যাস পাঠ করিতে ইতস্ততঃ করিলে, হে উপন্যাস পাঠক! আপনার পাঠ করা অসম্পূর্ণ রহিয়া যাইবে। মূল্য, দেড় টাকা।

(২২) বিরামকুঞ্জ—ক্ষীরোদবাবু নাটকে যেমন সিদ্ধহস্ত গল্পেও তেমনি। ইহাতে যে কয়েকটি সুলিখিত সুন্দর চিত্তাকর্ষক গল্প আছে তাহা পাঠ করিয়া সকলেই তৃপ্তি পাইবেন। সুন্দর ছাপা; সুদৃশ্য বাঁধাই; উপহার দিবার বিশেষ উপযুক্ত। মূল্য, বার আনা।

প্রকাশক—শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
২০১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।